দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

গণতান্ত্রিক ভারতকে শরিয়তি ভারত বানানোর চক্রান্ত ব্যর্থ করতে হবে
— পৃঃ ২৩

সংবিধানের যথার্থ রূপ না বোঝাই ভারতীয় গণতন্ত্রের সঙ্কট
— পৃঃ ১৯

৭০ বর্ষ, ২২ সংখ্যা।। ২২ জানুয়ারি ২০১৮।। ৮ মাঘ - ১৪২৪।। যুগাব্দ ৫১১৯।। সাধারণতন্ত্র বিশেষ সংখ্যা।। website : www.eswastika.com ।।

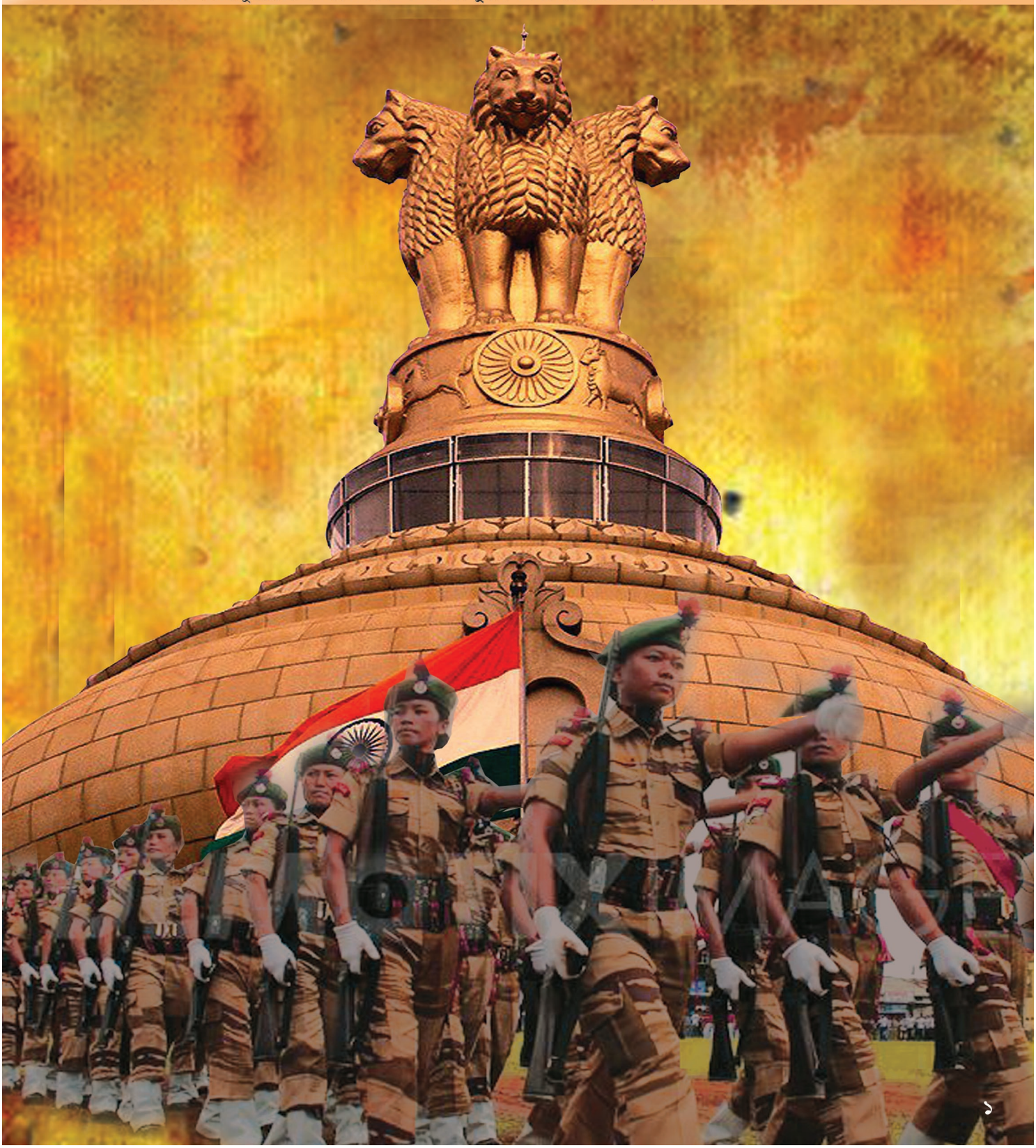

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

সাধারণতন্ত্র বিশেষ সংখ্যা

৭০ বর্ষ ২২ সংখ্যা, ৮ মাঘ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

২২ জানুয়ারি - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

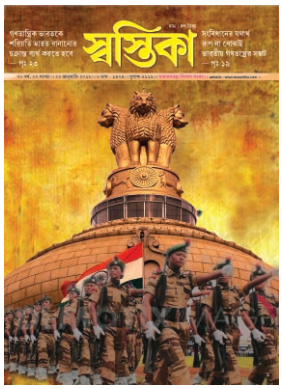

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৭

খোলা চিঠি : ডি লিট বনাম দিলীপ
□ সুন্দর মৌলিক □ ৯

মেধা নয়, রাজনীতিই এখন ঠিক করে যোগ্যতা
□ গূঢ়পুরুষ □ ১০

'মেগালোম্যানিয়াক' মমতা রাজ্যকে কানাগলিতে নিয়ে যাচ্ছেন
□ পুলক নারায়ণ ধর □ ১১

ত্রিপুরায় এককাট্টা বিজেপি— অষ্টম বামফ্রন্ট সরকার গড়ার পথটি মসৃণ নয় □ গৌতম দত্ত □ ১৬

সংবিধানের যথার্থ স্বরূপ না বোঝাই ভারতীয় গণতন্ত্রের সঙ্কট
□ দেবীপ্রসাদ রায় □ ১৯

গণতান্ত্রিক ভারতকে শরিয়তি ভারত বানানোর চক্রান্ত ব্যর্থ করতে হবে □ রন্তিদেব সেনগুপ্ত □ ২৩

দায়িত্বজ্ঞানহীন বিরোধিতা গণতন্ত্রের অশনি সঙ্কেত
□ অম্লানকুসুম ঘোষ □ ২৬

গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের অবক্ষয়ে ভারতীয় গণতন্ত্রের সঙ্কট সূচিত □ অভিমন্যু গুহ □ ২৭

পশ্চিমবঙ্গের শাসকের স্বৈরাচারী মানসিকতা শুধু 'গণতন্ত্রের সঙ্কট' নয়, সংবিধানেরও সঙ্কট □ অমলেশ মিশ্র □ ২৯

এবারের সাধারণতন্ত্রে ভারতের অতিথিরা □ ৩১

পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু ও হিন্দুত্বের সঙ্কট
□ অভিমন্যু বসু □ ৩২

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত □ সলিল গেঁউলি □ ৩৩

মহিলাদের প্রতি আবার অবিচার করা হলো
□ আরিফ মহম্মদ খান □ ৩৫

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ৩৭ □ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** □ **সুস্বাস্থ্য : ৪৩** □ **খেলা : ৪৪**□

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

তিন তালাক থেকে মুক্তি

সম্প্রতি তাৎক্ষণিক তিন তালাককে বেআইনি ঘোষণা করেছে সুপ্রিম কোর্ট। কয়েকশো বছর ধরে মুসলমান মহিলাদের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারে ঢেকে রাখা এই মধ্যযুগীয় প্রথা থেকে মুক্তির নেপথ্যে রয়েছে অনেক সংগ্রাম, অনেক চোখের জল এবং অপমান। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার আলোচ্য বিষয়— তিন তালাক। এই সময়ের বিশিষ্ট লেখিকা তনভির নসরিন আলোচনা করবেন তাৎক্ষণিক তিন তালাক নিয়ে। মুক্তির আর এক কারিগর ইশরাত জাহান স্বস্তিকার সঙ্গে একান্ত কথোপকথনে জানাবেন অনেক অজানা কথা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

Account Name : SWASTIKA

A/C. No. : 0314050014429

IFSC Code : UTBI0BIS158

Bank Name :

United Bank of India

Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বিচারবিভাগের মর্যাদা

সম্প্রতি আমাদের দেশে বিচার বিভাগে এক অমৈত্রীসুলভ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল। শীর্ষ আদালতের প্রবীণ চার বিচারপতি সাংবাদিক সম্মেলন করিয়া প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অভিযোগ, প্রধান বিচারপতি নিয়ম-নীতি না মানিয়া উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সংবেদনশীল জনস্বার্থ মামলা জুনিয়র বিচারপতিদের এজলাসে পাঠাইয়া দেন। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের এই বিদ্রোহ ছিল নজিরবিহীন। সুপ্রিম কোর্ট ভারতীয় সংবিধানের অভিভাবক। দেশের মানুষের কাছে শেষ ভরসাস্থল। সেখানেও বিদ্রোহ দেশের বিচার ব্যবস্থার স্বচ্ছতা লইয়াই প্রশ্ন তুলিয়া দিয়াছে। তবে আশার কথা, এই অচলাবস্থার অবসান হইয়াছে। চার বিদ্রোহী বিচারপতিই তাঁহাদের নির্দিষ্ট কাজে যোগ দিয়াছেন। বার কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া (বিসিআই)-র সভাপতি বিকাশ সিংহের নেতৃত্বে সাত সদস্যের এক প্রতিনিধি দল এই অচলাবস্থা অবসানে উদ্যোগী হয়। প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র ও চার বিদ্রোহী বিচারপতির সঙ্গে প্রতিনিধি দলের পৃথক পৃথক বৈঠকের পরই এই অচলাবস্থার সুরাহার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছিল।

চার বিচারপতির এইরূপ পদক্ষেপ কয়েকটি প্রশ্নের সৃষ্টি করিয়াছে। বিচারপতিদের অভিযোগ যদি সত্য বলিয়াও মনে হয়, তবে তাহা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিয়া সমাধান করিবার পরিবর্তে জনতার দরবারে পেশ করিলেন কেন? সাধারণ মানুষ এই বিষয়ে কী বলিবে? সাংবাদিক সম্মেলন করিয়া অভিযোগ জানানো ব্যতীত তাঁহাদের কি আর অন্য কোনও উপায় ছিল না? তাঁহারা কি রাষ্ট্রপতির নিকট বিষয়টি উত্থাপন করিতে পারিতেন না? কোনও মামলার শুনানি কোনও বিশেষ বেঞ্চে করিবার দাবি কি তাঁহারা জানাইতে পারিতেন না? প্রধান বিচারপতির প্রতি তাঁহাদের অবিশ্বাস প্রকাশ্যে জানাইয়া কি আশা করিতেছেন, এখন হইতে সব ঠিকমতো চলিবে? ওই চার বিচারপতির ইহাও বক্তব্য, তাঁহারা সকলেই সমানমর্যাদা সম্পন্ন, পার্থক্য মাত্র নম্বরের। প্রধান বিচারপতি এক নম্বর বিচারপতি মাত্র। তাঁহাদের এই অভিমত সুপ্রিম কোর্টের অন্য বিচারপতিদের ক্ষেত্রেও কি প্রযোজ্য নয়? অন্য বিচারপতিদের নিরপেক্ষতা লইয়াও কি প্রশ্ন উঠিতেছে না? সুপ্রিম কোর্টের বাকি ২০ জন বিচারপতি কি মামলার শুনানির জন্য যোগ্য নহেন ? এইরকম অনেক প্রশ্ন উঠিয়া আসিয়াছে যাহার উত্তর জনতার কাছে নাই।

অন্যদিকে এই ইস্যুকে কেন্দ্র করিয়া কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নেতারা যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা দুর্ভাগ্যজনক। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিআই) নেতা ডি রাজা ওই চার বিচারপতির মধ্যে একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার বাড়ি পর্যন্ত গিয়াছিলেন। কেন তিনি দেখা করিতে গিয়েছিলেন তাহার কোনও সদুত্তর দিতে পারেন নাই। কংগ্রেসের সভাপতি রাহুল গান্ধী চার বিচারপতির অভিযোগ খতাইয়া দেখিবার জন্য পূর্ণ আদালতের মাধ্যমে তদন্তের কথা বলিয়াছেন। ঘটনা হইল, বারবার জনগণের কাছে প্রত্যাখ্যাত হইয়াও কংগ্রেস এখন এই বিষয়টি হইতে রাজনৈতিক ফায়দা তুলিতে চাহিতেছে। কংগ্রেসের এই অবস্থান দুঃখজনক। এইক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান লক্ষণীয়। কেন্দ্র সরকার বিচারবিভাগের স্বাধীন সত্তাকে স্বীকার করিয়া শীর্ষ আদালতকেই বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য বলিয়াছে। বস্তুত ইহাই হওয়া উচিত।

সুভাষিতম্

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে।। (শ্রীগীতা ৩/২৯)

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেমন আচরণ করেন, অন্য ব্যক্তিরা তারই অনুসরণ করে। তিনি যা কিছু প্রমাণরূপে নির্দিষ্ট করে দেন, সকল মানুষ তাই অনুবর্তন করে।

ভীমা-কোরেগাঁও দাঙ্গায় মাওবাদী চক্রান্ত, ধৃত সাত সন্দেহভাজন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভীমা-কোরেগাঁও দাঙ্গায় মাওবাদী চক্রান্তের কথা এতদিন হাওয়ায় ভাসছিল। সম্প্রতি মহারাষ্ট্র পুলিশের সন্ত্রাস দমন শাখা (এটিএস) সাতজন মাওবাদী নেতাকে গ্রেপ্তার করায় পুলিশের সন্দেহ মান্যতা পেল। সূত্রের খবর, ধৃত নেতারা সকলেই গোল্ডেন করিডোর কমিটির সদস্য এবং তারা মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে মাওবাদী মতাদর্শ প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাদের কাছে ভীমা-কোরেগাঁও যুদ্ধের ২০০তম উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান সম্পর্কিত প্রচুর ব্যানার-লিফলেট পাওয়া গেছে। সেসব বাজেয়াপ্ত করেছে এটিএস। এখন তারা খতিয়ে দেখবেন মুম্বই এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় সাম্প্রতিক কালে ঘটে যাওয়া বেশ কিছু নাশকতামূলক ঘটনার পিছনে ধৃতদের হাত রয়েছে কিনা।

সন্ত্রাসদমন শাখার এক আধিকারিক বলেন, 'নিষিদ্ধ সংগঠন সিপিআই (মাওবাদী) নেতাদের সম্বন্ধে গোপনসূত্রে খবর পাওয়ার পরই কালাচৌকি থানার অফিসারেরা কল্যাণ স্টেশন থেকে এক নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চলতি মাসের বারো তারিখে এটিএস নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে খবর পেয়ে কল্যাণ স্টেশনে হানা দেয়। সেখানেই গ্রেপ্তার করা হয় এক মাওবাদী ক্যাডারকে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় সন্তোষজনক উত্তর না মেলায় পুলিশ তাকে হেফাজতে নেয়। শুরু হয় দীর্ঘ জেরা। শেষ পর্যন্ত ওই ব্যক্তি স্বীকার করেন যে তিনি এবং তার কয়েকজন সহকর্মী কামরাজনগর, রমাবাই আম্বেদকর নগর এবং বিক্রোলি অঞ্চলে আনলফুল অ্যাকটিভিটিজ (প্রিভেনশন) অ্যাক্ট, ১৯৬৭ আইনে নিষিদ্ধ সিপিআই (মাওবাদী) দলের মতাদর্শ প্রচারের কাজে নিযুক্ত। তার কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে আরও ছ'জনকে গ্রেপ্তার করে।

এটিএসের আধিকারিকেরা জানিয়েছেন ধৃতরা সকলেই সিপিআই (মাওবাদী) নামের সংগঠনটির কুখ্যাত গোল্ডেন করিডোর কমিটির সদস্য। গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের একটি বিশেষ অংশকে আগেই গোল্ডেন করিডোর বলে চিহ্নিত করেছে মাওবাদীরা। গ্রেপ্তার হওয়া নেতারা দুই রাজ্যের সেই বিশেষ অংশে মাওবাদী মতাদর্শ প্রচার ও প্রসারের কাজে যুক্ত ছিলেন। তাদের সঙ্গে বাম-সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের আত্মগোপনকারী নেতাদের যোগাযোগ রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিকে, ভীমা-কোরেগাঁওয়ের ঘটনায় কংগ্রেস এবং তার দোসর দলগুলির সাম্প্রতিক জাতপাত ভিত্তিক রাজনীতির প্রভাব রয়েছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। তাদের অভিযোগ, রাজনীতিতে নেতিবাদ বাড়তে থাকলে এই ধরনের ঘটনাও বাড়বে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ব্রিটিশ আমলে দলিতদের সাহায্যে ইংরেজরা পেশোয়াদের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছিল। সেই ঘটনারই দু'শো বছর উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান হলো এ বছর। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেদিন জনজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত কিছু মানুষ বিশেষ স্মৃতিস্তম্ভ আক্রমণ করে বসে। সংঘর্ষ দাঙ্গায় রূপান্তরিত হয়। নিহত হন একজন। পুলিশ কড়া হাতে হাল ধরায় ঘটনা বেশিদূর এগোয়নি।

বিহার কংগ্রেসে কি ভাঙন আসন্ন?

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বিহার কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে এসেছে। বিহার প্রদেশ কংগ্রেসের ভূতপূর্ব প্রধান অশোক চৌধুরীর সমর্থক ১৭ জন বিধায়ক সম্প্রতি কংগ্রেস পরিষদীয় দলনেতা সদানন্দ সিংহের বিহারের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে ডাকা সভায় অনুপস্থিত থাকেন। বিহারের আর জে ডি নেতা লালুর পশুখাদ্য মামলায় জেল যাত্রা পরবর্তী পরিস্থিতি ও কংগ্রেসের অবস্থান নিয়ে এই মিটিং ডাকা হয়েছিল বলে খবর। প্রসঙ্গত, বিহার বিধানসভায় কংগ্রেসের আসন সংখ্যা ২৭। গত ২৬ সেপ্টেম্বর বিহার প্রদেশ কংগ্রেস প্রধানের পদ থেকে অশোক চৌধুরীকে সরিয়ে দেওয়ার পর থেকেই এই বিধায়করা কোনও না কোনও অছিলায় বিভিন্ন মিটিং এড়িয়ে চলেছেন।

প্রসঙ্গত গত শনিবারের মিটিংটি পরিষদীয় নেতা সদানন্দ দিল্লির এআইসিসি-র সাধারণ সম্পাদক ও বিহারের ভারপ্রাপ্ত নেতা সিপি যোশীর অনুমোদন ক্রমেই আহ্বান করেছিলেন। দলে সর্বাপেক্ষা প্রবীণ ও ন'বারের বিধায়ক সদানন্দ প্রত্যেক বিধায়ক ও কার্যকর্তাদের ব্যক্তিগতভাবে সভায় যোগদানের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সূত্র অনুযায়ী লালুর জেলযাত্রা ও তৎপরবর্তী উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান নেওয়ার কারণেই এই মিটিং ডাকা হলেও, বিধায়কদের তাকে এড়িয়ে চলা তাৎপর্যপূর্ণ বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

দেশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রবীণদের পাশে আছে : প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ 'সশস্ত্র বাহিনীর প্রত্যেক সদস্যের আত্মোৎসর্গের ভাবনায় সেবাপরায়ণ থাকার জন্য গোটা দেশ গর্বিত। আমাদের সদা নির্ভরযোগ্য সশস্ত্র বাহিনীর ইতিবাচক ভূমিকার জন্যই আমরা গর্বে মাথা উঁচু করে দুনিয়ার মুখোমুখি হই। দেশ আপনাদের আত্মত্যাগের কথা কখনো ভুলবে না। এর ফলে তাদের যে অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, সরকার সর্বক্ষণ পাশে থেকে যতদূর সম্ভব স্বস্তি প্রদানে আন্তরিক থাকবে'। সারা দেশে গত ১৪ জানুয়ারি সশস্ত্র বাহিনীসমূহের প্রবীণ দিবস উদ্‌যাপিত হয়। প্রবীণদের প্রতি সম্মান ও দায়বদ্ধতার প্রমাণ হিসেবেই দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী ড. সুভাষ ভামরে দিল্লি ক্যান্টনমেন্টের মানেক শ' কেন্দ্রে এই উপলক্ষে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী বক্তব্যে কথাগুলি বলেন। ১৯৫৩-তে এই দিনটিতেই দেশের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের প্রথম ভারতীয় প্রধান ফিল্ড মার্শাল কে.এম. কারিয়াপ্পা অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর স্মৃতিতেই প্রতিবছর দিনটি উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানের আগে সি আই এস সি-র চেয়ারম্যান তথা সুসংহত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনার প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল সতীশ দুয়া প্রবীণ সেনাকর্মীদের উপস্থিতিতে অমর জওয়ান জ্যোতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। নয়াদিল্লি, এলাহাবাদ, মুম্বই, পোর্টব্লেয়ার, পুনে, লক্ষ্ণৌ, জলন্ধর, জয়পুর-সহ সারা দেশের ৮টি সেনাঘাঁটিতে এই উপলক্ষে তিন বাহিনীর প্রবীণ কর্মীদের সমাবেশও অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সৈনিক বোর্ড, ই সি এইচ এস, তিন বাহিনীর প্রবীণদের নির্দেশালয়-সহ প্রবীণদের বিষয়ে সক্রিয় অনুমোদিত সংস্থাসমূহ এই অনুষ্ঠানগুলিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অবসরভাতা মঞ্জুরি ও প্রদান সংক্রান্ত সংস্থার পক্ষ থেকে সমাবেশের জায়গায় প্রবীণদের পাশাপাশি তাঁদের পরিবারবর্গের সামনে বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলার লক্ষ্যে স্টল খোলা হয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কসমূহের পক্ষ থেকেও সহায়তা-মূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। মূল অনুষ্ঠানে প্রতিরক্ষা রাষ্ট্রমন্ত্রী ই সি এইচ এস-এর নতুন ও পরিমার্জিত কার্ডের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন। প্রবীণ সৈনিকদের সমাবেশে প্রাক্তন সৈনিক কল্যাণ সচিব শ্রীমতী সঞ্জীবনী কুট্টি জানান, প্রাক্তন সৈনিকদের যে সমস্যার মুখে পড়তে হয়, তা থেকে উত্তরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রবীণ সৈনিকদিবস উদ্‌যাপনের এই অনুষ্ঠানে স্থলসেনা প্রধান জেনারেল বিপিন রাওয়াত, নৌ সেনাপ্রধান অ্যাডমিরাল সুনীল লানবা ও বায়ুসেনা প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল বি এস ধানোয়া-সহ সশস্ত্র বাহিনী এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বরিষ্ঠ আধিকারিকরাও অংশগ্রহণ করেন।

ড. সুভাষ ভামরে

প্রধান বিচারপতির সমর্থনে ২১ বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলায় বিচারপতি নিয়োগ নিয়ে প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের চার প্রধান বিচারপতির অভিযোগ সংক্রান্ত সাংবাদিক সম্মেলনের প্রবল বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। মহামান্য শীর্ষ আদালতের অন্য ২১ জন বিচারপতি একযোগে এই প্রকাশ্য সাংবাদিক সম্মেলনের বিরোধিতা করেছেন এবং প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এই বিচারপতিরা একবাক্যে জানিয়েছেন যে, ওই চারজন বিচারপতি তাঁদেরই সমকক্ষ। সেই সূত্রে আদালতের বাইরে আনার আগে তাঁদেরও এ বিষয়ে জানানো উচিত ছিল। অনায়াসে সমস্ত বিচারপতিদের নিয়ে 'ফুল কোর্ট' ডেকে প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে ক্ষোভের সমাধান সূত্র বের করা যেতেই পারত বলে তাঁদের অভিযোগ। তাঁরা আরও বলেন, আইন ব্যবস্থা ও মহামান্য আদালত এই দু'টির ওপরই দেশের মানুষের অগাধ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আজও অটুট। এইভাবে প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অভিযোগ আনলে ভবিষ্যতে প্রধান বিচারপতিদের সম্পর্কে নাগরিকদের ধারণায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে। একই সঙ্গে বিচারব্যবস্থার অঙ্গীভূত জেলা ও উচ্চ আদালতগুলির প্রধান বিচারপতিদের সম্পর্কেও সহজেই অভিযোগ তোলা হবে। এই সূত্রে সুপ্রিম কোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশন তাদের সভায় দু'টি সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছে।

প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র

(১) তারা মহামান্য প্রধান বিচারপতিকে চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেছে যাতে তিনি অনতিবিলম্বে এই সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে একটি ফুল কোর্ট-এর অধিবেশন ডাকেন। (২) মহামান্য প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে থাকা বেঞ্চ যেন সমস্ত জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলাগুলি (পিআইএল) শোনেন বা চারজন সর্বাপেক্ষা প্রধান বিচারপতিদের নেতৃত্বে বেঞ্চ গঠন করে তাঁদের অধীনে মামলাগুলি বণ্টন করে দেন। সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিকাশ সিংহের সাংবাদিক বৈঠকের সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

McLEOD RUSSEL INDIA LIMITED

FOUR MANGOE LANE, SURENDRA MOHAN GHOSH SARANI, KOLKATA 700 001
TEL: +91 33 22487100; 22101221; 22489435. FAX: +91-33-22488114, +91-33-22486824
Email: administrator@mcleodrussel.com, teasales@mcleodrussel.com
Website: www.mcleodrussel.com

McLEOD RUSSEL

Believe in tea

ASSAM ESTATES

Addabarie, Attabarrie, Attareekhat, Baghjan, Bargang, Beesakopie, Behali, Behora, Bhooteachang, Bogapani, Bordubi, Borengajuli, Boroi, Bukhial, Corramore, Daimukhia, Dehing, Dekorai, Dimakusi, Dirai, Dirial, Dirok, Dufflaghur, Halem, Harchurah, Hunwal, Itakhooli, Lepetkatta, Keyhung, Koomsong, Mahakali, Margherita, Mijicajan, Monabarie, Moran, Namdang, Nya Gogra, Paneery, Pertabghur, Phillobari, Phulbari, Raidang, Rajmai, Rupajuli, Samdang, Sepon, Tarajulie, Tezpore & Gogra

DOOARS ESTATES

Bhatpara, Central Dooars, Chuapara, Jainti, Mathura

VIETNAM ESTATES

Doan Hung, Ha Hoa, Phu Tho, Van Linh, Khan Hoa, Tai Trung, Ngoc Hai

UGANDA ESTATES

Ankole, Bugambe, Kiko, Muzizi, Mwenge, Kisaru

RWANDA ESTATES

Gisovu, Pfunda

WM *A Williamson Magor Group Enterprise*

ডি লিট বনাম দিলীপ

মাননীয় দিলীপ ঘোষ
সভাপতি, রাজ্য বিজেপি
৫, মুরলীধর সেন লেন, কলকাতা

মুখ্যমন্ত্রী ডি লিট উপাধিধারী। গর্ব অনুভব করুন দিলীপবাবু। হিংসা আপনি করবেন না জানি কিন্তু একটু প্রচার করুন। সগর্বে বলুন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শিল্প, কলা সাহিত্য সর্ব ক্ষেত্রে পারদর্শী। তিনি মহান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহান ডি লিট। তিনি এত বড় ডি লিট যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সামনে উপাচার্যকে নাম ধরে ডাকতে পারেন। এর আগে মুখ্যসচিব থেকে শিল্পপতি সকলকে নাম ধরে ডেকে অনেক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, এবার উপাচার্য। গর্ব অনুভব করুন দিলীপবাবু গর্ব।

বিতর্ক কম হয়নি। বিতর্ক হাইকোর্টেও পৌঁছে গিয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সাম্মানিক ডি লিট ডিগ্রি দেবে, এই ঘোষণা হওয়ার পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচনার ঝড় বয়ে গিয়েছিল। মামলা হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। কিন্তু এটা কি ঠিক বলুন! দিলীপবাবু আপনারা ক্ষমতা থেকে অনেক দূরে কিন্তু যেভাবে দিনের পর দিন দিদিকে কোণঠাসা করে চলেছেন তাতে ডি লিট না হলে লড়াই দেওয়া যায়! তাই তো দিদি ডি লিটি নিয়ে নিলেন। দিলীপবাবু আপনার বড় নেতা নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহদের কাছেও ক-বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি লিট নেই। দিদির আছে।

দিদি শুধু হাতে কিছু নেন না। তাই সমাবর্তন উৎসবের মঞ্চ থেকেই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, রাজ্য সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভাবনী গবেষণার জন্য ১০০ কোটি টাকার অনুদান দেবে। তবে দেওয়া আর নেওয়া পরিষ্কার হলো তো!

দিদির অবশ্য ইচ্ছাই ছিল না এমন সম্মান নেওয়ার। গত তিন মাস ধরে তাঁকে ডি লিট দেওয়ার সিদ্ধান্ত জানার পরে কিছু বলেননি। কিন্তু ঠিক নিতে যাওয়ার দিনে তিনি নাকি বেঁকে বসেন। সেটা কেউ অবশ্য দেখেনি। দেখেছেন শুধু নাকি তাঁর শিক্ষামন্ত্রী। আবার সেটা শিক্ষামন্ত্রীও বলেননি। বলেছেন দিদি নিজে।

ভরা সমাবর্তন উৎসবের মঞ্চ থেকেই মমতা অনুযোগ করলেন, 'আমি এই সম্মানের যোগ্য নই। আমার জীবন অবহেলার, অসম্মানের। ডি লিট নিয়েও আমাকে কম অসম্মান করা হয়নি।' খোলাখুলিই জানান, এই সম্মান গ্রহণ করতে তিনি আসবেন কী আসবেন না, তা নিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর মনে দ্বিধা ছিল। এ নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্বও হয়েছিল বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। যাই হোক, তিনি শেষ পর্যন্ত এসেছিলেন। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সামাজিক অবদানের জন্য মমতাকে শেষ পর্যন্ত সাম্মানিক ডি লিট দিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

এর আগে মমতার ভুয়ো পিএইচডি ডিগ্রি নিয়েও বিতর্ক হয়েছিল। এবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডি লিট দেওয়ার কথা ঘোষণা করার পরেও হিংসুটে রাজনৈতিক মহলে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। কেউ কেউ বলেছেন, ''এর থেকেই বোঝা যায় রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থায় পা চাটার ও তোষণ করা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে।'' কেউ বলেছেন, 'তৃণমূলের বর্ধিত শাখা'।

প্লিজ দিলীপবাবু, আপনি আর কিছু বলবেন না। রাজ্যে প্রধান বিরোধী মুখ হিসেবে আপনার কাছে একটাই অনুরোধ দিদির ডি লিট প্রাপ্তি নিয়ে গর্ববোধ করুন।

কেন্দ্রে তো আপনাদের সরকার। দিদির জন্য বড় কিছু পুরস্কারের জন্য নাম প্রস্তাব করুন না। প্লিজ। দেখুন না দিদি যদি ভারতরত্ন না হোক কমপক্ষে 'মুখ্যমন্ত্রীশ্রী' নামে কোনও নতুন সম্মান পেয়ে যান।

রাজ্য বুঝতে পেরেছে কংগ্রেস, সিপিএম প্রায় নেই। এখন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিপক্ষ বিজেপিই। মানে লড়াইটা ডি লিট বনাম দিলীপের। লড়াই থাকুক। কিন্তু ডি লিট দিদিকে নিয়ে গর্বও যেন থাকে।

—**সুন্দর মৌলিক**

মেধা নয়, রাজনীতিই এখন ঠিক করে যোগ্যতা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্প্রতি সাম্মানিক ডি লিট দিয়েছে তাঁর সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য। ভুললে চলবে না তিনি এমন একজন মহামানবী যাঁকে এত দেরিতে সাম্মানিক ডি লিট দেওয়ার জন্য প্রতিটি শিক্ষিত বাঙালির লজ্জিত হওয়া উচিত। রাজ্যের প্রশাসন চালানো থেকে দলের চেলা চামুণ্ডাদের দাপটে রাখা সবই একা করেন তিনি। এরই ফাঁকে খান চল্লিশেক থান ইঁটের সাইজের বই লিখে ফেলেছেন। কবিতা, গান লেখা থেকে সুর বসানো সব করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর এতবড় প্রতিভা বাংলায় আর দেখা যায়নি। দিদি মস্ত বড় চিত্র শিল্পী। আপন খেয়ালে যে ছবি আঁকেন ভক্তরা কোটি টাকায় কিনে নিজেদের ধন্য মনে করেন। দিদি টিভিতে গভীর রাত পর্যন্ত সমস্ত বাংলা মেগা সিরিয়াল দেখেন এবং সিরিয়ালের মুখ্য চরিত্রগুলির চরিত্র পাল্টে দেন। অর্থাৎ, যে চরিত্রটি ভিলেন দিদি ফোন করে সিরিয়ালের রচয়িতাকে বলে দেন যে পরের এপিসোডে চরিত্রটিকে মহান উদার সাধু করতে। দিদির উপদেশ মেনে চললে আখেরে লাভ অনেক। রাজ্য মহিলা কমিশনের হর্তাকর্তা হয়ে মোটা মাইনের সমাজসেবী হওয়া যায়। দিদির এই বহুমুখী প্রতিভাকে কুর্নিশ জানিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই সম্মানিত হয়েছে।

জ্যোতি বসুও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডি লিট। কিন্তু তখন তিনি আর মুখ্যমন্ত্রী নন। বুদ্ধদেববাবু রাজ্যের জমিদারির দখল নিয়েছেন। বিনিময়ে জ্যোতি বাবুকে কিছু একটা দিতে হয়। তাই বুদ্ধ-বিমান- অনিল ত্রয়ী ঠিক করলেন বুড়ো মানুষটাকে শেষ বয়সে ডি লিট উপাধি দিয়ে শান্ত করা যাক। সেদিন জ্যোতিবাবুকে ডি লিট দেওয়া নিয়ে কেউ আপত্তি বা সমালোচনা করেননি। জ্যোতিবাবু তাঁর সারা জীবনে কিছু লেখেননি। এমনকী সরকারি ফাইলে সই করতেন জে বি নামে। জ্যোতি বসু পুরো নাম লিখতেন না। এতটাই অলস ছিলেন। গান শোনা বা ভাল সিনেমা দেখা তাঁর ধাতে সইতো না। রাজ্যের মানুষের স্বার্থে ব্যক্তিগত উদ্যোগে জ্যোতিবাবু একটিও উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নিয়েছিলেন এমন কোনো নজির আমার জানা নেই। তবু কলকাতা

গূঢ় পুরুষের কলম

বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টর অব লিটেরেচার বা ডি লিট উপাধি দিয়েছিল কেন? প্রশ্নটা করতে হচ্ছে, কারণ সিপিএম নেতারা মমতাকে ডি লিট দেওয়া নিয়ে হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন। বাম নেতারা ভুলে গেছেন যে তাঁদের জমানায় বাংলার সার্বিক অবনতি হয়েছিল। তাঁদের উচিত বাংলার মানুষের কাছে ক্ষমা চাওয়া।

সিপিএম যে পথে হেঁটে বাংলার সর্বনাশ করেছিল, দিদি এবং তাঁর দল বর্তমানে সেই পথে চলেছে। সিপিএম একদা পাড়ায় পাড়ায় বিরোধী কণ্ঠস্বর রোধে গুণ্ডা বাহিনী পুষতো। মমতা সেই গুণ্ডাদেরই তৃণমূলে আশ্রয় দিয়েছেন। এতকাল মাজাভাঙা সিপিএম-কংগ্রেসের নেতাদের নিয়ে মমতার সমস্যা ছিল না। সমস্যাটা হয়েছে, বিজেপির নবোত্থানের পর।

রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব মমতাকে ডি লিট দেওয়া নিয়ে আদালতে যায়নি। দলের রাজ্য সভাপতি জানতে চেয়েছেন কীভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিজে শিক্ষা জগতের লোক না হয়েও স্রেফ দিদি নামক খুঁটির জোরে উপাচার্য বনে গেলেন। অতীতে নামকরা শিক্ষাবিদরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছেন। দলীয় আনুগত্যের জন্য নয়। দলের অনুগতদের উপাচার্য করে দেওয়াটা মার্কসবাদীদের কালচার ছিল। এখন তৃণমূলের কালচার হয়েছে। আমি বাজি রেখে বলতে পারি যে রাজ্যের ছ'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের নাম এবং তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা জানেন এমন কেউ নেই। রাজ্যজুড়ে শিক্ষাক্ষেত্রে যে অরাজকতা চলছে তার জন্য দায়ী তৃণমূলের শিক্ষানীতি। কলেজের টিচার্স রুমে ঢুকে শিক্ষকদের মারধর করাটাই তৃণমূলের শিক্ষানীতি।

এতকাল রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনি। তৃণমূলের রাজত্বে আঙুল উঠেছে, বোঝা যাচ্ছে একদল অযোগ্য অশিক্ষিত লোক রাজ্য পি এস সি চালাচ্ছে। ফলে আদালতের নির্দেশে ডব্লিউ বি সি এস অফিসার নিয়োগ এখন বন্ধ। ঘটনাটি এই রকম। বিসিএস পরীক্ষায় বসা প্রার্থীদের উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য পি এস সি-র নিজস্ব মডেল উত্তরপত্রে অজস্র ভুল আছে। অর্থাৎ, পরীক্ষায় সঠিক উত্তর লিখলে ফেল করিয়ে দেওয়া হবে। এবং তাই করা হয়েছে। যাঁরা ভুল উত্তর লিখেছেন তাঁরা পাশ করেছেন। যাঁরা সঠিক লিখেছেন তাঁরা ফেল। কত বছর ধরে তৃণমূলীরা এই কাণ্ড করে চলেছেন জানা নেই। তবে ২০১৭ সালে ঘটনাটি প্রকাশ্যে এসেছে। অযোগ্যতাই এখন যোগ্যতা। পি এস সি-র চেয়ারম্যান দীপঙ্কর দাশগুপ্ত নীরব। ২০১৬ সালে চেয়ারম্যান ছিলেন শহিদুল ইসলাম। তাঁর সময়েই হয়কে নয়, নয়কে হয় করা হয়। শহিদুল সাহেব বলছেন, আমার কিছু মনে নেই। ড. মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চুপ কেন? তাঁর মতো অতিমানবী মুখ্যমন্ত্রীর কোনো দায় নেই? তবে কী আমরা ধরে নেব যে তৃণমূলের প্রধান খুঁটিটিকে না ধরলে পি এস সি-র পরীক্ষায় সফল হওয়া সম্ভব নয়। মেধা নয়, শিক্ষা এবং প্রশাসনে দলীয় রাজনীতি এখন শেষ কথা বলে। ড. বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই শিক্ষা নীতি বাঙালি যত তাড়াতাড়ি বুঝবে ততই মঙ্গল।

‘মেগালোম্যানিয়াক’ মমতা রাজ্যকে কানাগলিতে নিয়ে যাচ্ছেন

পুলকনারায়ণ ধর

১৯৮৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে যাদবপুর কেন্দ্র থেকে সিপিএমের জাঁদরেল প্রার্থী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে পরাজিত করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সারা দেশে একটা চমক সৃষ্টি করেছিলেন। তখন তিনি অজানা অখ্যাত একটি সাধারণ মহিলা। সেই থেকে তাঁর অনমনীয় ভাব ও লড়াকু চরিত্র তিনি বহুকাল বিরোধী নেত্রী হিসেবে বজায় রেখেছিলেন। পরিশেষে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সিপিএমের চৌত্রিশ বছরের কুশাসন দূর করতে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের পথ ধরে মানুষ যখন এগিয়ে এল তখন তিনি রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রধান সারিতে এলেন। ইতিমধ্যে কংগ্রেস দল থেকে বেরিয়ে এসে তিনি তৈরি করেন তৃণমূল কংগ্রেস (১ জানুয়ারি ১৯৯৮)। মানুষ তাঁকে গ্রহণ করেছিল সিপিএম বিরোধী নেত্রী হিসেবে। তিনি শাসন ক্ষমতায় এসে (২০১১) সিপিএমের অপকর্ম ও অসংস্কৃতি দূর করবেন এটাই ছিল পশ্চিমবঙ্গবাসীর প্রত্যাশা।

কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিয়ে দিলেন যে বিরোধী নেত্রী মমতা আর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভিন্ন ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর মন্ত্রীসভা গঠন করেন ‘ভৃত্যসম সদস্যদের’ নিয়ে। বাঙুর নিউরোলজিক্যাল হাসপাতালের কর্তব্যপরায়ণ অভিজ্ঞ ডাক্তার-সুপারকে সাসপেন্ড করে বুঝিয়ে দিলেন তাঁর মেজাজ ও রাজ্যশাসনের ব্যাকরণ। এরপর ক্রমশ তাঁর নজর পড়ে সংবাদ মাধ্যমগুলির ওপর। সংবাদপত্রে তাঁর সমালোচনা বন্ধ করার জন্য নানারকম ফর্মূলা প্রয়োগ করা হয়। স্বাধীন মনোভাবাপন্ন সাংবাদিক সম্পাদক ও লেখকরা কলম ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। হিটলার, মুসোলিনী স্তালিনের পথ ধরে তিনি বিরোধী মতামতের ওপর লাগাম পরালেন। তাঁর বিরোধিতা করলেই কেউ নকশাল, কেউ মাওবাদী আবার কেউ সিপিএমের চর বলে অভিহিত হন। তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ লেলিয়ে দেন।

ইতিহাস প্রত্যেক নেতা বা নেত্রীর ভূমিকা নির্দিষ্ট করে দেয়। সেই ভূমিকার অবসানে তাঁকে চলে যেতে হয়। রোবসপেয়ার থেকে শুরু করে স্তালিন, হিটলার, মাও জে দং এবং সাম্প্রতিককালের জ্যোতি বসু, পলপটেরও একই পরিণতি হয়েছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রশাসক হিসেবে তাঁর সীমাবদ্ধতা বুঝতে পারেন। গণতন্ত্র স্থাপনের জন্য তিনি অঙ্গীকার করেছিলেন যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে দলহীন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে রূপায়িত করবেন। কিন্তু চরম বলদর্পী দলীয়তায় তা আগাপাশতলা আজ মুড়ে দিয়েছেন। তাঁর প্রতিশ্রুতির মধ্যে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল শিক্ষাক্ষেত্র থেকে দলীয় রাজনীতি ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবেন। কিন্তু হয়েছে একেবারেই উল্টো। স্কুল-কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় -গুলিতে পদলেহী নবান্ন দাসদের দিয়ে প্রশাসন চালাচ্ছেন। তৃণমূলের গুণ্ডাছাত্ররা এদের ওপর নজর রাখেন। বহু উপাচার্যের উপাচার্য হবারই শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই। হতাশাগ্রস্ত রাজ্যের শিক্ষাজগতের চেহারা। যে শিক্ষাকে সিপিএম সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস সেই ব্যবস্থারই জোয়াল কাঁধে তুলে নিয়েছে। সে ক্ষেত্রেও যত রাজ্যের সিপিএমের প্রাক্তন খেলোয়াড়দেরই বসানো হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ পদে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চুরি-জোচ্চুরির রমরমা। স্কুল-সার্ভিস কমিশন, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরিষদ কোনোটাই দুর্নীতির অভিযোগ থেকে মুক্ত নয়। প্রাথমিক শিক্ষা কমিশনে তো দীর্ঘদিন ধরে এক প্রচ্ছন্ন সিপিএম কর্তা ব্যক্তি চেয়ারে বসে আছেন। স্কুল-সার্ভিস কমিশনেও এক অবস্থা। ত্রিপুরা ফেরত এক সিপিএম চালবাজ রাজত্ব করছে। লক্ষ্য করার বিষয় যে, তৃণমূলের শিক্ষা নীতি (?) বা বিভিন্ন শিক্ষা পরিষদের কাজকর্মের বিরুদ্ধে সিপিএম টুঁ শব্দটিও করে না। কারণ কিছু অপদার্থ অযোগ্য তৃণমূল মাতব্বর ও তাদের স্থাপিত ব্যক্তিদের সাহায্যেই সিপিএম তার রাজত্ব কায়েম রেখেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর শিক্ষামন্ত্রী এসব কতটা বোঝেন জানি না। কিন্তু সাধারণ মানুষ ও শিক্ষাজগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। এখানে সততার কোনো স্থান নেই। তিন বছরে সরকার অনেক সরকারি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়েরও ছড়াছড়ি। কিন্তু তার উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই, ইউ জি সি স্বীকৃতিও নেই। শিক্ষা শুধু সংখ্যাবাচক

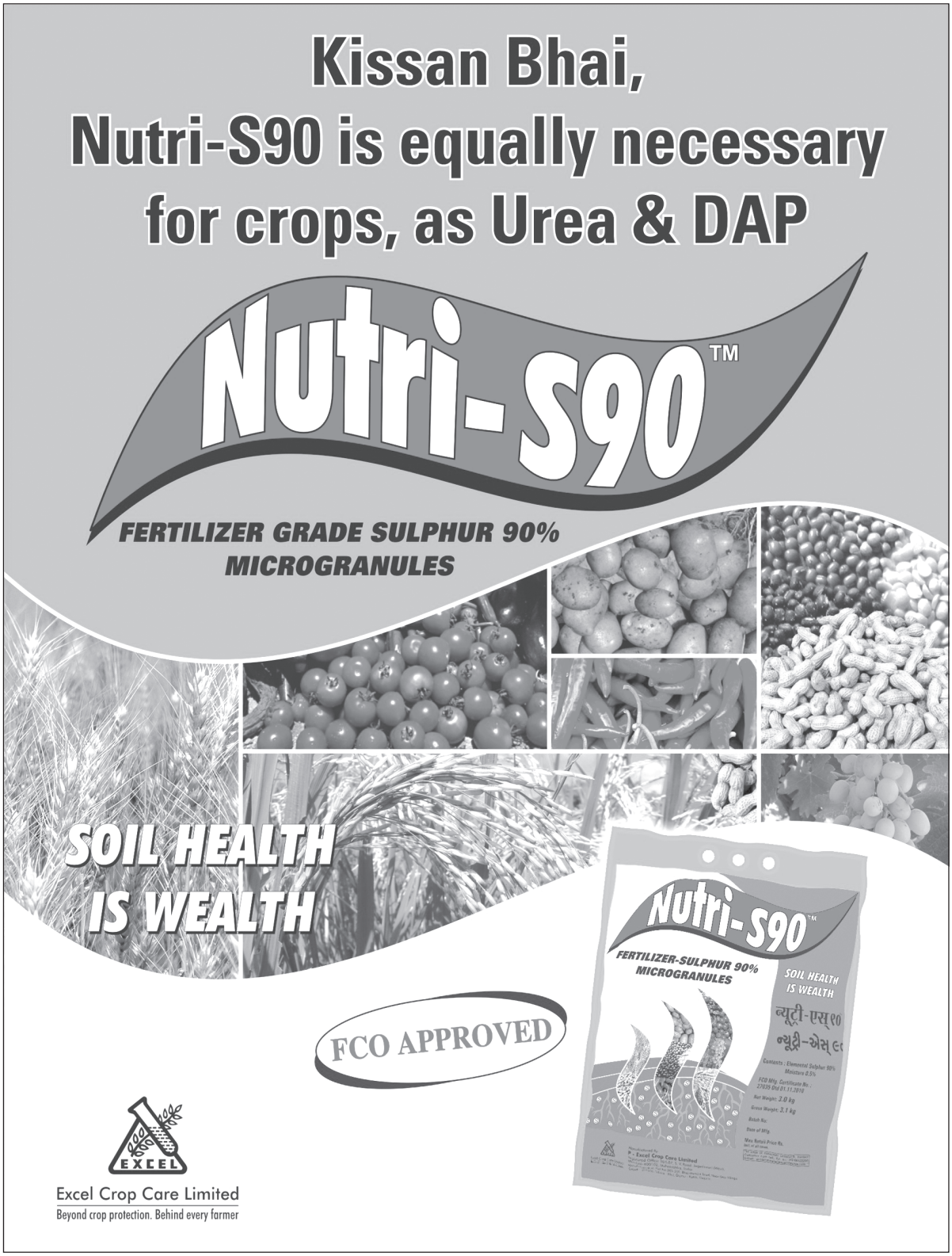
Kissan Bhai,
Nutri-S90 is equally necessary
for crops, as Urea & DAP
Nutri-S90™
FERTILIZER GRADE SULPHUR 90%
MICROGRANULES
SOIL HEALTH
IS WEALTH
FCO APPROVED
Nutri-S90™
FERTILIZER-SULPHUR 90%
MICROGRANULES
SOIL HEALTH
IS WEALTH
EXCEL
Excel Crop Care Limited
Beyond crop protection. Behind every farmer

অগ্রগতি নয়। এক্ষেত্রে তাই বলতে হবে শিক্ষাকে দলের প্রভাবের বাইরে রাখার প্রতিশ্রুতিও রক্ষিত হচ্ছে না। তৃণমূল কংগ্রেস যদি শিক্ষায় দলীয়তার প্রবেশ বন্ধ রাখতে পারত তবে সিপিএমের সাধ্যও ছিল না সেক্ষেত্রে প্রবেশ করার। পুরানো শিক্ষক কর্মচারীরা তো থাকবেনই। এরা সিপিএম, বিজেপি, কংগ্রেস দলের ভাবানুগত্য প্রদর্শনও করতে পারেন। গণতন্ত্রে এতে বাধা দেবার কারণ নেই। ভয়ের কিছু নেই। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষিত হতো। কোনো কিছু জোর করে দখল করতে গেলে ভয়ভীতি প্রদর্শন অবশ্যম্ভাবীই হয়ে ওঠে। তখনই প্রয়োজন হয় শিক্ষাজগতের সঙ্গে সম্পর্ক-রহিত পাণ্ডাদের। মা-মাটি-মানুষের সরকার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির বিপরীত দিকেই হেঁটেছে।

বাঙালি সমাজের অনগ্রসর অংশের উন্নতির প্রকল্পে তিনি বেছে নিয়েছেন মুসলমান মোল্লাদের। সংবিধানের নিয়ম বা মূলমন্ত্র অগ্রাহ্য করে সরকারি কোষাগার থেকে টাকা দান করে হিন্দু পুরোহিত, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধদের বিরূপতা অর্জন করেছেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার পরিবর্তে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের নতুন সূত্র তৈরি করেছেন মমতা। ক্ষমতায় এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করলেন মুসলমানদের জন্য একটি হাসপাতাল তৈরি করবেন। বিশেষ কোনো রোগের, যেমন স্নায়ুরোগ বা ক্ষয়রোগ কিংবা ক্যানসার এই রকম রোগভিত্তিক হাসপাতালের কথা আমরা জানি। কিন্তু মুসলমান, খ্রিস্টান, জৈন্য, বৌদ্ধ এই রকম ধর্মভিত্তিক হাসপাতালের ভাবনা ভূভারতে এর আগে শোনা যায়নি। কিন্তু এই ধরনের সাম্প্রদায়িক ভাবনা ও উদ্ভট চিন্তা যে তাঁর মস্তিষ্কে এসেছে সেটাই বিপজ্জনক। মুর্শিদাবাদ, উলুবেড়িয়া, বর্ধমান, বীরভূম, মালদা প্রভৃতি অঞ্চল জুড়ে যে 'জামাতপন্থী' মুসলমানরা অবাধ ক্রিয়াকলাপ করে চলেছে সে সম্বন্ধে তিনি ও তাঁর প্রশাসন নীরব। সম্প্রতি হাওড়ার শ্যামপুকুর ও সাহেবগঞ্জে পুলিশের ওপর আক্রমণ মুসলমান ভোটারদের জন্য মমতার অতিরিক্ত আস্কারারই পরিণতি। রাজ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি হিন্দু সমাজের একটা বিরূপতা সৃষ্টি করার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোষণ নীতিই দায়ী। এই দৃষ্টিভঙ্গি মুসলমান সমাজের কোনো উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করবে না। মুসলমান সমাজের সুবিধাভোগীরা এই মওকায় কলাটা মুলোটা যা পারে আদায় করে নেবার মতলবে তাঁর পাশে এসে ভিড়েছে। তাদের কাজ হচ্ছে মুসলমান সমাজের গরিব মানুষদের মমতার দাসত্বের জোয়ালে বেঁধে ফেলা। এর ফল হবে মারাত্মক। দেশবিভাগের প্রাক্কালে যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি হয়েছিল সেই রাজনীতির ছবি আজ আবার ফুটে উঠছে। সে সময় সেই তোষণমূলক রাজনীতি করেছিল কংগ্রেস। আজ সেই পতাকা হাতে তুলে নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ভ্রমাত্মক তথা মারাত্মক ফাঁদে পড়েছেন। রাজ্যে বহু জায়গায় প্রায় ৬৫টি জেহাদি বা জঙ্গি 'মডিউল'-এর সন্ধান পাওয়া গেছে। বাংলাদেশ থেকে পলাতক প্রায় ১৮০ জন জঙ্গি নেতা এ রাজ্যের নানা স্থানে লুকিয়ে আছে। পুলিশও এ ব্যাপারে সব না জানা না দেখার ভান করছে। এর সূচনা গত বামফ্রন্টের জমানায় শুরু হয়েছিল। মা-মাটি-মানুষের সরকার তা অব্যাহত রেখেছে। গণতন্ত্র নয়, সাম্প্রদায়িক ভোটেই দলকে মজবুত রাখার প্রকৃষ্ট পন্থা বলে বিবেচিত। এটা একটি বিপজ্জনক লাইন। জেহাদিদের সহ্য করাই আমাদের রাজ্যে সহিষ্ণুতা। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছবিওয়ালাদের ডেকে দেখিয়ে দেখিয়ে গোমাংস খেলেই সহিষ্ণুতার প্রকট প্রকাশ।

বাংলা যে কতটা ধর্মনিরপেক্ষ এটা প্রমাণ করতেই সুবোধ সরকারের মতন তৃণমূলি বুদ্ধিজীবীরা সক্রিয়। ক্ষমতায় আসার এক বছরের মধ্যেই তিনি ঘোষণা করলেন যে সংখ্যালঘুদের (মুসলমান) জন্য তাঁর পরিকল্পনার ৯০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে। আশ্চর্য ও চমকপ্রদ এই তথ্য যে কত মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তা মুসলমান সমাজের বুঝতে দেরি হয়নি। এবার তাদের তোষণের জন্য তাঁর দল সংসদে তিন তালাকের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে কার্যকরীর জন্য আনীত বিলের বিরোধিতায় নেমে হট্টগোল করছে। রাজ্যের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি গত তিরিশ বছরের মতোই একই খাতে প্রবাহিত। অশান্তি ও অনিশ্চয়তার সুড়ঙ্গ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যবাসীকে মুক্ত করতে পারেননি। ইদানীং মনে হচ্ছে তাঁর দলের নেতা উপনেতাদের ওপর তাঁর লাগাম আলগা হয়ে যাচ্ছে। পুলিশ প্রশাসনের ওপর অত্যধিক নির্ভরতা ও আই এ এস এবং আই পি এস অফিসারদের চাটুকারিতায় তিনি একদা উত্তরপ্রদেশের মায়াবতীর মতন আপ্লুত ও বিপথে চালিত হচ্ছেন। প্রতিটি জেলায় তাঁর দলের অন্তর্বিরোধ তীব্রতর হচ্ছে। প্রথম থেকে শক্ত হলে আরাবুল-বুলবুলরা দাপিয়ে বেড়াতে পারত না। এ অবস্থায় শিল্পের আগমন দূরঅস্ত। বাংলার যুবকরাও ক্রমশ নিরাশাবাদী হয়ে উঠছে। টাকা নেই পয়সা নেই এমন এক ঋণগ্রস্ত রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। কিন্তু আয় বাড়াবার কোনো পন্থাই জানা নেই। বামপন্থীদের চেয়েও অতিরিক্ত বামপন্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এস ই জেড-এর ঘোরতর বিরোধী। জমিনীতিও এক অদ্ভুত জটে আটকে আছে। শিল্প এলে যে কর সংগ্রহও বাড়বে সে কথা তাঁকে কে বোঝাবে? নানা ধরনের চটকদারি ও 'অ্যাডহক' কর্মসূচিতেই সরকার জড়াচ্ছে। মাঝে মধ্যে তা প্রায় ছেলেখেলার মতন। কোথাও পরিণত মনস্কতা বা বাস্তব বুদ্ধির ছাপ নেই। যারা দলের মধ্যে থেকে প্রশাসনের সুবিধা নিয়ে লুটেপুটে খাচ্ছে তারা সন্ত্রাসব্রত নিলেও সংগঠনের স্বার্থে ক্ষমার্হ। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝতে পারছেন না যে শুধু সংগঠনের জোরে চিরকাল ক্ষমতায় টিকে থাকা যায় না। সিপিএমের চেয়ে মজবুত ও বড় সংগঠন

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :-

ASHOKA TOOLS PVT. LTD.

MECHANICAL & STRUCTURAL ENGINEERS

-: REGD. OFFICE :-

23A, Netaji Subhas Road,

11 th Floor, Room No. 31,

Kolkata-700 001

Phone No. 9331223004

-: FACTORY :-

Santra para, Par Dankuni

Hooghly, Pin- 712310

PHONE : OFFICE : 2231-9166/

FAX NO : (033) 2231-9166,

PH. 9903853534

With the best Compliments from :

JALAN CHEMICAL & INDUSTRIES PVT. LTD.

Director : Rajesh Jain

27AB Royd Street, Ground Floor

Kolkata-700016

Phone : 22297263

রাজ্যে আর কোন দলের ছিল? ক্ষমতা থেকে চলে যেতে হয়েছে মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার ফলে। মমতা ক্ষমতায় এসেছে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসা ও আশীর্বাদ পেয়ে— তাঁর সংগঠনের জন্য নয়। ক্ষমতায় বসে তিনি মানুষকে সংগঠন চেনাচ্ছেন। এই সংগঠনের ধূর্ত বুলবুলিরা এবার তাঁকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। দলের বর্তমান চেহারা ও 'মাটির কমরেডদের' দেখে মানুষ ক্রমশ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে। নদীয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা প্রভৃতি জেলায় জেলায় দলের কর্মীদের ওপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে আগের মতন নিয়ন্ত্রণ নেই। সাধারণ মানুষের ওপর তাঁর নামের 'ম্যাজিক'ও আর আগের মতন কাজ করছে না। দলে দলে সিপিএম ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানকারী স্রোতধারা এখন বিজেপিমুখী। সংঘর্ষ বাড়ছে। পুলিশ প্রশাসন কাঠের পুতুল।

মন্ত্রীসভার মন্ত্রীরাও সদাসর্বদা নেত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। স্বাধীন ভাবে বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করার কোনো ক্ষমতা তাঁদের নেই। মুখ্যমন্ত্রী একাই সব। আমলা বা মন্ত্রীরা কেউ তাঁর ভুল ধরাবার সাহস রাখেন না। কোরানের মতন তাঁকে পবিত্র জ্ঞান করেন। 'আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়'— নেতা ও মন্ত্রীরা মুখে এই কথাটি উচ্চারণ না করে কোনো কথাই বলেন না। তাঁর সাংগঠনিক সৎ বুদ্ধির পরিচয়ও ইদানীং পাওয়া যাচ্ছে না। দলাদলি বা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে তাঁর প্রত্যক্ষ মদত না থাকলে দলের বর্তমান এই হাল হয় না। একটা অহেতুক ভয় তাঁকে বরাবরই তাড়িয়ে বেড়ায়। সর্বদাই তাঁর মনে হয় তাঁর চেয়ে অন্য কোনো নেতা জনপ্রিয়তায় এগিয়ে যাবে না তো? নন্দীগ্রামের এত বড় আন্দোলনের পর মুখ্যমন্ত্রী হয়েও তিনি সেখানকার মানুষের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সৌজন্য পর্যন্ত দেখাননি। কারণ শুভেন্দু অধিকারীকে সহ্য করতে না পারা। দল থেকে বা তাঁর পাশ থেকে যাদের তিনি সরিয়ে দেবার কথা ভাবেন তারা দলের ও মানুষের অপরিমেয় ক্ষতিসাধন করার পর তাঁর বোধোদয় হয়। বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের তিনি সামনের সারিতে বসান না। তাঁর আসন দখল করার ক্ষমতা বা ইচ্ছা তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো নেতারই নেই। অথচ তিনি কল্পিত ঈগল পাখির ভয়েই ত্রস্ত হয়ে থাকেন। এই কারণেই তিনি দলের পদগুলি আযোগ্য বা দুষ্টুবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা ভর্তি করেন। সম্প্রতি তাঁর ভাইপোকে গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে সংগঠনকে কতটা মজবুত করলেন তা অদূর ভবিষ্যতে বোঝা যাবে। তাঁর কাজকর্ম বরাবরই খামখেয়ালিপূর্ণ। বিরোধী নেত্রী হিসেবে যা সহ্য করা যায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তা অনভিপ্রেত এবং ক্ষতিকারক। দলের প্রবীণ নেতা ও মন্ত্রীদের তিনি উপেক্ষা করে দূরে রেখেছেন। সামনে এনেছেন অর্বাচীনদের, টলিউডের নিষ্প্রভ তারকাদের সামনের সারিতে এনেছেন। আবার তাঁর সমস্ত কাজে অস্থির বুদ্ধি ও আত্মবিশ্বাসের অভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। দলের সর্বস্তরে হীনমন্যতা ও আত্মবিশ্বাসের অভাব সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে ইন্দিরা গান্ধীও তাঁর নিজের সৃষ্ট কংগ্রেস দলটার সর্বনাশ করেছিলেন। অবশ্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্দিরা গান্ধী নন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি অতিরিক্ত মমতায় অনেকেই মনে করেন তিনি একা আর কত করবেন? মৌলিক প্রশ্ন হলো, কেন তিনি একা? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেস ও নিজেকে সমার্থক করে ফেলেছেন। এখানেই তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। যৌথ দায়িত্ব পালন তাঁর চারিত্রিক ধর্ম নয়। আদতে তৃণমূল কংগ্রেস একটি দলহীন দল। এক গুচ্ছ লোকের ঝুটি ধরে তিনি টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর দল ও সরকারের ভালো ফল যদি তাঁরই প্রাপ্য বলে বিবেচিত হয় তবে তাঁর ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত ও তার কুফলের ভাগও সম্পূর্ণ তাঁকেই নিতে হবে। আরাবুলকে কিছুদিন দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। কিন্তু তার অপরাধ ও পাপের বোঝা কে বইবে? কার প্রশ্রয়ে তিনি এই সন্ত্রাসী ও তোলাবাজি কর্মধারা চালিয়ে গেছেন অপ্রতিহত ভাবে? মুখ্যমন্ত্রীকেই এই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। এখানে শুধু দল নয় প্রশাসনের ভূমিকাও তিনি উপেক্ষা করতে পারেন না। তিনি মানুষের আস্থা অর্জন করে রাজ্যের মুখ্য প্রশাসক হয়েছেন। কিন্তু মানুষ যে দিনকে দিন প্রশাসনের উপর আস্থা হারাচ্ছে সে খবর কি তিনি রাখেন? তিনি বুঝবার চেষ্টা করুন মানুষ কেন তাঁর কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে? তিনি কি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মতই মদমত্ত 'মেগালোম্যানিয়াক' ও আত্মঘাতী হয়ে উঠছেন না? সমালোচনা সহ্য করা রাজধর্ম। এটাই গণতন্ত্রের মূল কথা। এই ব্যাপারটি সিপিএম নষ্ট করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও কি সিপিএমের প্রাণহীন দেহটা বয়ে বেড়াবেন? দলের ভেতরে ও বাইরে সমালোচনা সহ্য করার গুণ আয়ত্ত করা এবং তাঁর কর্মধারা ও ব্যবহার সংশোধন করা তাঁর সামর্থ্যের বাইরে। সুতরাং চোরাবালিতে তাঁর নিমজ্জন অনিবার্য। পশ্চিমবঙ্গে শুধু তৃণমূলেরই পতাকা শোভিত হবে এই ধারণা ও 'writ' জারি করলে রাজ্য একটি যুদ্ধক্ষেত্রেই পরিণত হবে। গণতন্ত্র ধ্বংস হবে। রাজ্য পরিণত হবে 'অসহিষ্ণুতা'র কৃষি জমিতে। যুদ্ধক্ষেত্রে শুধু যুদ্ধই হয়। কোনো গঠনমূলক কর্মসূচি রূপায়িত হবে না। যততত্র টাকা বিলি করে উন্নয়নের সূচক রচিত হয় না। আর এই টাকা বিলিকে কেন্দ্র করে তাঁর দলে দিকে দিকে সৃষ্টি হচ্ছে ভাঙন তথা 'ভাঙর'। মমতার সাধ্য কী তা ঠেকায়?

মমতা নিজেকে নিজেই নানা মিথ্যার মায়াজালে বদ্ধ করেছেন। তিনি নিজেই নিজের সৃষ্টি। বিনিময়ের মূর্ত প্রতীক। তিনি নিজেকে নিজেই বিনাশ করবেন। তাঁর বিনাশ ঘটলে রাজ্যের কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু তিনি যা করে যাচ্ছেন তার ফল বহুদিন বাঙালিকে ভুগতে হবে। ■

ত্রিপুরায় এককাট্টা বিজেপি

অষ্টম বামফ্রন্ট সরকার গড়ার পথটি মসৃণ নয়

আগরতলা থেকে গৌতম দত্ত ॥ ত্রিপুরায় বামফ্রন্টের পরাজয় সুনিশ্চিত করতে বিজেপি এখন আদাজল খেয়ে কোমর বেঁধে নেমেছে। একটানা দীর্ঘ ২৫ বছর ক্ষমতায় থাকা মার্কসবাদী শাসনের অবসান ঘটিয়ে সরকার গঠনের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে বিজেপি। ১৯৯১ সালে বিজেপি নেতা শ্যামহরি শর্মার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর ত্রিপুরায় এই দল দুর্বল হয়ে পড়েছিল। রাজ্যস্তর থেকে বুথস্তর পর্যন্ত তাদের ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী সংগঠন ছিল না। একদিকে দলের দুর্বলতা অপরদিকে বিরোধী কংগ্রেসের নিস্ক্রিয় ভূমিকা এ রাজ্যে বামফ্রন্টকে দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষমতায় টিকে থাকার সুযোগ করে দিয়েছে। ১৯৯৩ সাল থেকে বামফ্রন্ট একটানা ক্ষমতায় টিকে রয়েছে। কেন্দ্রের ও রাজ্যের কংগ্রেসের সঙ্গে মিতালির সম্পর্ক এই টিকে থাকার আরও একটি বড় কারণ। এই সুযোগ এখন আর দিতে রাজি নয় বিজেপি, যেহেতু

উদয়পুরে বিশাল সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন অমিত শাহ।

দল এখন কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি জোট কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর তার রাজনৈতিক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে যেসব রাজ্যে তার মধ্যে অন্যতম ত্রিপুরা। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ আসন্ন নির্বাচনে ত্রিপুরা বিধানসভাকে কমিউনিস্ট মুক্ত করার লক্ষ্যে নির্দেশ দিয়েছেন।

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইতিমধ্যে রাজ্যস্তর থেকে বুথস্তর পর্যন্ত দলের নানা কমিটি গঠন করা হয়েছে। ৬০টি বিধানসভা কেন্দ্রে ৩১৭০টি বুথ কমিটি গঠনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া মহিলা মোর্চা, যুব মোর্চা, কৃষাণ মোর্চা, তপশিলি মোর্চা, ওবিসি মোর্চা ইত্যাদি গঠন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে বিজেপি লাগামহীন খুন-সন্ত্রাস, ১০,৩২৩ জন শিক্ষকের চাকুরী বাতিল, নারী নির্যাতন, প্রশাসনিক দুর্নীতি, চিটফান্ড কেলেঙ্কারি, সরকারি অর্থ তছরূপ, আর্থিক বিশৃঙ্খলা, বেকার বঞ্চনা, গ্রামীণ ও পাহাড়ি এলাকায় অনগ্রসরতা ইত্যাদি বিষয়গুলি ব্যাপক প্রচারের আলোকে নিয়ে এসে শহর ও গ্রামের সংগঠন এমনভাবে সাজিয়েছে যে এখানে এখন প্রবল প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

পরিবর্তনের পক্ষে ব্যাপক জনমত সংগঠিত করার লক্ষ্যে প্রায় প্রতিদিনই কোনও না কোনও কেন্দ্রীয়মন্ত্রী বা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কোনও না কোনও মন্ত্রী-বিধায়ক দলের কর্মকাণ্ডে যোগ দিচ্ছেন। ইতিমধ্যে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ এবং সাধারণ সম্পাদক রামমাধব, মহিলা মোর্চার সর্বভারতীয় সভানেত্রী বিজয়া রাহাতকর, কেন্দ্রীয় রেল রাষ্ট্রমন্ত্রী রাজেন গোঁহাই, অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী প্রেমা খাণ্ডু, নেভার চেয়ারম্যান তথা অসমের অর্থমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সংগঠন মহামন্ত্রী অজয় জাম্বুয়াল প্রমুখ কয়েকবার ত্রিপুরা সফর করেছেন। নির্বাচনী প্রচারে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথেরও আসার কথা।

গুজরাটের নির্বাচনে বিজেপি দলের জয়ের ঘটনার পর ত্রিপুরায় এর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। ত্রিপুরায় বিরোধী দল কংগ্রেসের ন'জন বিধায়কের মধ্যে সাতজন বিধায়ক হাতছাড়া হয়েছে। বিজেপি এক ধাক্কায় অনেকটাই শক্তি বাড়িয়ে নিতে সফল হয়েছে।

গুজরাট নির্বাচনের ফল ঘোষণার আগে কংগ্রেসের ছয় বিধায়ক বিজেপি দলে যোগ দিলে দলের তরফে তাদের বরণ করে নেওয়া হলো। গুজরাট জয়ের পর ২২ ডিসেম্বর মোহনপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত কংগ্রেস বিধায়ক তথা প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা রতন নাথ সদলবলে বিজেপিতে যোগ দিলেন। তাঁর সঙ্গে একই দিনে কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপি দলে শামিল হলেন আগরতলা পুর নিগমের নির্বাচিত সদস্যা তথা পুর কাউন্সিলার হিমানী দেববর্মা। একই সঙ্গে বিজেপির জমায়েতে মোহনপুরের প্রবীণ সিপিএম নেতা আনন্দমোহন দাস বিজেপিতে যোগদান করলেন। সেদিন রামচন্দ্রঘাট বিধানসভা কেন্দ্রে ১৬৪ জন

ত্রিপুরার রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের সাংবাদিক সম্মেলন।

ভোটার সিপিএম ভেঙে বিজেপিতে যোগ দেয়। ২৩ ডিসেম্বর পানিসাগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ৫৭ জন জনজাতি ভোটার সিপিএম ছেড়ে বিজেপিতে আসে। ২৫ ডিসেম্বর বড়জলা বিধানসভা কেন্দ্রে ৩২৯ জন ভোটার সিপিএম ত্যাগ করে গেরুয়া দলে যোগদান করে। ২৭ ডিসেম্বর রাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস ও সিপিএম ছেড়ে ৬৫ জন কর্মী পথ শিবিরে যোগ দেয়। ২৮ ডিসেম্বর বড়দোয়ালী বিধানসভা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস ও সিপিএম ছেড়ে ৯১টি পরিবার বিজেপিতে যোগদান করে। একই দিনে বাগমা এলাকা থেকে ৬১ জন ভোটার সিপিএম থেকে বিজেপি দলে শামিল হয়। ২৯ ডিসেম্বর ফটিককয় বিধানসভা কেন্দ্রে ৬০ জন ভোটার সিপিএম ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেয়। ১ জানুয়ারী বাগমায়া সিপিএম ও আইপিএফটি দলের ৭৮ জন ভোটার বিজেপি দলে আসে। ৩ জানুয়ারি খোয়াই বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিএম ছেড়ে ১১৯ জন ভোটার বিজেপিতে যোগ দেয়। ৪ জানুয়ারি কমলপুরে বিলাসছড়া পঞ্চায়েত এলাকায় ১০৩ জন ভোটার সিপিএম ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করে।

গুজরাট নির্বাচনের আগেও কল্যাণপুর, গোসাই, ধর্মনগর, ছাসনু, পানিসাগর, সোনামুড়া, কাকড়াবন, সাব্রুম প্রভৃতি জায়গা থেকে গ্রামীণ অঞ্চলের এরকম বহুসংখ্যক ভোটার গেরুয়া শিবিরে যোগ দিয়েছে। দলত্যাগীদের বক্তব্য হলো স্বচ্ছ ও সু-শাসক, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, উন্নয়ন ও 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' গড়ার জন্য বিজেপি দলের দরকার। তাই তারা আগামী বিধানসভা নির্বাচনের মাধ্যমে ত্রিপুরায় বিজেপি সরকার গঠনের লক্ষ্যে এই দলে যোগ দিয়েছে। এভাবে অন্যান্য দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদানের ধারা বেড়েই চলেছে।

সরকার পরিবর্তনের মানসিকতা নিয়ে দলের কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরের নেতারা যেভাবে এককাট্টা হয়ে ত্রিপুরায় ভোটযুদ্ধে নেমেছে, সেটা এরাজ্যে কংগ্রেস বিরোধী দলে কিংবা কেন্দ্রে কংগ্রেস ক্ষমতাসীন থাকার সময়ে দেখা যায়নি। তিন বছর আগে বিজেপি পরিচালিত দ্বিতীয় এনডিএ সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর উত্তর-পূর্বাঞ্চলসহ প্রায় সারা ভারতে কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট শাসন মুক্ত ভারত গড়ার ক্ষেত্রে যে নজির সৃষ্টি করেছে, এর প্রভাব এখন ত্রিপুরায়ও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এতদিন ত্রিপুরায় কমিউনিস্টদের ভাগ্য নির্ধারণ করত কেন্দ্র-রাজ্যের কংগ্রেস। এখন কেন্দ্র-রাজ্যের কংগ্রেসের ওপর ভরসা করে ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে থাকার দিন যে ফুরিয়ে আসছে বামেদের তা বুঝিয়ে দিতে চায় বিজেপি। উত্তর ও পশ্চিম ভারতে, এমনকী উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সাম্প্রতিক নির্বাচনে বিজেপি জনমতের যে ঝলক দেখালো তাতে বুঝিয়ে দিয়েছে ত্রিপুরায় মার্কসবাদীদের অষ্টম বামফ্রন্ট সরকার গড়ার পথটি মসৃণ নয়, বরং কণ্টকাকীর্ণ।

২৭ ডিসেম্বর বিধানসভা ভিত্তিক পদযাত্রা ও প্রতিবাদ সমাবেশ করে অনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী প্রচার অভিযান শুরু করল বিজেপি। সেদিন একযোগে ত্রিপুরার ষাটটি বিধানসভা কেন্দ্রে এই সমাবেশের আয়োজন করে বিজেপি তাদের শক্তি প্রদর্শন করল। এই সমাবেশের স্লোগান ছিল— 'হয়তো তোমাদের ক্ষমতা, কিন্তু বিচার করবে জনতা।' এই স্লোগানটি সামনে রেখে বিগত কয়েকমাসে পাঁচজন বিজেপি কর্মী এবং দুই মাসের ব্যবধানে দু'জন সাংবাদিক হত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে সারা রাজ্যে সবক'টি মণ্ডলে পরিবর্তন সভার আয়োজন করা হয়। রাজ্য নেতৃত্ব ছাড়াও এসব সমাবেশে অসমের ছত্রিশজন মন্ত্রী-বিধায়ক অংশ নেন।

গুজরাট নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ বলেন, পরবর্তী লক্ষ্যই হবে ত্রিপুরা। স্পষ্টভাবেই তিনি ঘোষণা করেছেন বিজেপি ত্রিপুরায় সরকার গড়বে। বিজেপির অগ্রগতিকে প্রতিহত করা সম্ভব হবে না। কিন্তু যেখানে বিধানসভা, ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি), আগরতলা পুরনিগম, গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ, নগর পঞ্চায়েত সবই বামেদের দখলে, এই অবস্থায় ত্রিপুরায় বিজেপি কি বামফ্রন্টকে ধরাশায়ী করতে পারবে? ■

ড. মনিমোহন ভট্টাচার্য
স্বামীজী পুত্র নেতাজী
(১ম খণ্ড) ₹ ৩৫০
(২য় খণ্ড) ₹ ৩৫০

দেবীপ্রসাদ রায়
প্রসঙ্গতঃ মানবেন্দ্রনাথ (এম.এন.রায়)
₹ ২০০

ড. সিসিলা দে সরকার (বসু)
কথা সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু
₹ ২৫০

সুনীল দাস
চারটি রহস্য উপন্যাস
₹ ২০০

প্রদীপ ঘোষ
লোকসংস্কৃতির বিপন্নতা ও অন্যান্য
₹ ১৫০

হরিবংশ রাই বচ্চন
অনুবাদ : সুমিতা ভৌমিক
মধুশালা
₹ ১০০

নির্মল ঘোষ
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
সংশয়ে ও স্বপ্নে
₹ ১৫০

আহমদ রফিক
জাতিসত্তার আত্মঅন্বেষা
বাঙালী ও বাঙলাদেশী
₹ ২০০

শেখর সেনগুপ্ত
শ্রী অরবিন্দ : সার্বিক মূল্যায়ণ
(১ম খণ্ড) ₹ ২৫০

আহমদ রফিক
এই অস্থির সময়
₹ ১৭৫

পরিমলকান্তি ভট্টাচার্য
মন ক্যামেরা
₹ ২০০

শেখর সেনগুপ্ত
পঞ্চ ঋষির রমণীচক্র
₹ ২৫০

Dr. Subhrendu Bhattacharjya
Affinity between Blake's Views And Indian Philosophy
INR : 500

ড. বিজয় আঢ্য
পুরাণের পৃষ্ঠা থেকে
₹ ২০০

বিপ্লব মজুমদারের
রণিদা রহস্য ট্রিলজি
₹ ২৫০

সৌরকুমার বসু
শান্তিনিকেতন ও নকশাল আন্দোলন
₹ ২০০

সাতটি রহস্য উপন্যাস
শেখর সেনগুপ্ত
₹ ৩৫০

কথামৃতসার
(শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত অবলম্বনে)
সংকলক জীবনীকার
মণি বাগচি
₹ ২০০

সিদ্ধার্থ সিংহ
নামগোত্রহীন
₹ ৩৫০

মুকুল গুহ
খর্সাং পাহাড়ের রহস্যটিলা
₹ ২৭৫

Anjusri Chandra
Roaming from Place to Place Country to Country
₹ ২০০

প্রিটোনিয়া
১৪ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯ • ফোন : ২২৪১ ২১০৯, ৬৪৫৪-২১০৯
email : publishers.pritonia2015@gmail.com

PIONEER®
EXERCISE BOOK
Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery
PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

সবার প্রিয়
বিল্লদা®
চানাচুর
BILLADA CHANACHUR
KALIKAPUR, BOLPUR, BIRBHUM, WB
Tel.: 03463 252447, Mob.: 9434306796

সংবিধানের যথার্থ স্বরূপ না বোঝাই ভারতীয় গণতন্ত্রের সঙ্কট

দেবীপ্রসাদ রায়

ভারতের সংবিধান পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সংবিধান। দীর্ঘ সময় ধরে আলাপ- আলোচনা বিশ্লেষণের পর এই সংবিধান রচিত হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংবিধানকে সামনে রেখে মানুষের সাম্য, স্বাধীনতা ও মানবতাবোধের সুস্থ বিকাশের উদ্দেশে এই সংবিধান রচিত হয়। এর রূপকার ছিলেন ড. ভীমরাও আম্বেদকর। এই সংবিধান রচনায় উপস্থাপিত ইতিহাস অনুযায়ী নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংবিধান রচনার জন্য প্রারম্ভিক 'কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি' বা সাংগঠনিক সভা তৈরির দাবি ওঠে ১৯৩৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসে। ১৯৩৯ সালের ১৫ নভেম্বর রাজাগোপাল আচারিয়া এই দাবি তোলেন। ব্রিটিশ সরকার ১৯৪০ সালে আগস্ট মাসে এই প্রস্তাব গ্রহণ করে। ঠিক এই পর্যায়ে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক এই প্রস্তাব স্বীকার করে নেওয়ার বাধ্যবাধকতা নিয়ে কিছু বলা দরকার। আস্তে আস্তে সমগ্র ভারতে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা যে ইংল্যান্ড থেকে লোক আনিয়ে সম্ভব নয় তা ব্রিটিশ প্রশাসকরা বুঝতে পেরেছিল। তাই সীমিত ক্ষেত্রে প্রশাসনে ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রিত নিয়োগের উদ্যোগ

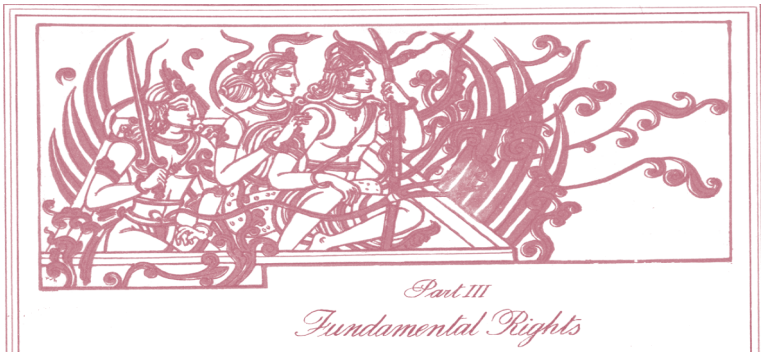

নেওয়া হয়। কিন্তু তাতেও দমনমূলক প্রশাসনের কারণে জনজীবনে স্বস্তিবোধ ছিল না, অসন্তোষ বাড়তেই থাক ছিল, অন্যদিকে ইউরোপীয় 'রেনেসাঁ'র প্রভাবে ভারতীয় নবজাগরণে স্বাদেশিকতার উদ্ভব ও প্রসারে স্বশাসনের জন্য দাবি উঠতে থাকে। রাষ্ট্র প্রশাসনের কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দিলেও দেশের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে থাকে, বিশেষ করে ১৮৫৭ সালে প্রথম স্বাধীনতা মহাযুদ্ধের মতো ঘটনা ঘটলে ইংরাজ প্রশাসন নির্মমভাবে তা দমন করার পাশাপাশি নানারকম শাসন সংস্কারের মাধ্যমে ভারতবাসীর অসন্তোষ প্রশমনের চেষ্টা করতে থাকে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বহুমুখী প্রয়াসে ব্যতিব্যস্ত ও ভীত ইংরাজ একটু একটু করে ভারতীয়দের দাবি মানতে রাজি হয়েও কূটনৈতিক প্রয়াসে ভারতবাসীদের মধ্যে Divide and Rule নীতি গ্রহণ করে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকেই হিন্দু-মুসলমান বিভাজন নীতি গ্রহণ করে ব্রিটিশ সরকার। ভারতীয়দের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ চাপা দিতে ১৯৪০ সালের ৮ আগস্ট তৎকালীন ভাইসরয় লিনলিথগো ইউরোপে ক্ষমতার পুনর্বিন্যাসের টালমাটাল অবস্থা বিবেচনায় যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল এবং একটি ওয়ার কাউন্সিল গঠনের জন্য বিবৃতি দেন। 'আগস্ট অফার' নামে পরিচিত এই বিবৃতিতে সংখ্যালঘুদের মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিল ব্রিটিশ কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী। এই 'অফার' অনুযায়ী ১৯৪৬ সালে ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনার আওতায় Constituent Assembly বা সাংগঠনিক সভার জন্য প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

Constituent Assembly হলো দেশের বিভিন্ন প্রশাসনিক অংশে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা তৈরি একটি সভা যারা আবার একটি কমিটি গঠন করে তার উপর সংবিধানের খসড়া তৈরি করার দায়িত্ব দেবে। সংবিধান তৈরি হয়ে গেলেই Constitent Assembly-র কাজ শেষ— একে তখন ভেঙে দেওয়া হবে। ১৯৪৬ সালের ১৬ মে ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা রূপায়িত হয়। সাংগঠনিক সভার সদস্যদের নির্বাচিত করা হয় প্রাদেশিক সভাগুলির দ্বারা আনুপাতিক একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট ব্যবস্থার দ্বারা। সাংগঠনিক সভার মোট সদস্যপদ ছিল ৩৮৯, তার মধ্যে ২৯২ ছিল রাজ্য বা প্রাদেশিক প্রতিনিধি, ৯৩ জন ছিল দেশীয় করদ রাজ্যগুলির প্রতিনিধি, আর ৪ জন ছিল অন্য, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত-সহ কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলের। এরপর স্বতন্ত্র মুসলমান রাষ্ট্রের জন্য দেশে দাঙ্গার উদ্ভব হয়। অবশেষে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা প্রত্যাহার করে Indian Independence Act অনুযায়ী দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তান গঠনের কথা ঘোষণা করেন। অবিভক্ত সাংগঠনিক সভার প্রথম মিটিং হয় ১৯৪৬ সালে ৯ ডিসেম্বর। তার পর দেশবিভাজনের পর শেষ মিটিং হয়েছিল ২৪ জানুয়ারি ১৯৫০। খসড়া সংবিধান মূল

সংবিধানে উত্তীর্ণ হবার পর ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি পরিপূর্ণ ভাবে কার্যকর হয়।

সাংগঠনিক সভার প্রথম সভাপতি হন ড. সচ্চিদানন্দ সিনহা অস্থায়ী ভাবে, পরে সভাপতি নির্বাচিত হন ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ। ১৯৪৬ সালে সাংগঠনিক সভার সাংবিধানিক উপদেষ্টা হন বি এন রাউ। স্বরাষ্ট্র গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোভিত্তিক সাধারণ সংবিধানের খসড়া তিনিই করেন— সহকারী ছিলেন ড. হরেন্দ্রনাথ মুখার্জী। তিনি ছিলেন তৎকালীন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। চূড়ান্ত খসড়াটি হয় ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। তারপর এটির উপর বিতর্ক চলে এবং চূড়ান্ত রূপটি হয় ২৬ নভেম্বর ১৯৪৯ সালে এবং তা গৃহীত হয় সংসদে Preamble বা উদ্দেশিকা ঘোষণার মাধ্যমে। ওইদিন যে ধারাগুলি কার্যকর হয় সেগুলি হলো— ৫, ৬, ৭,৮, ৯, ৩০, ৩২, ৩৬, ৩৬৭, ৩৭০, ৩৮০, ৩৮৮, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩।

সংবিধানে ছিল মোট ৩৯৫টি ধারা যা ২২টি অংশে ধৃত এবং ৮ সিডুইল-সহ শব্দ সংখ্যা ছিল— ১,৪৫০০০। উপস্থাপিত ৭৬৩৮টি সংশোধনীর মধ্যে গৃহীত ২৪৭৩টি সহ বাকি ধারাগুলি কার্যকর হয় ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ সালে অর্থাৎ সাধারণতন্ত্র দিবস হিসেবে যে দিনটিকে আমরা পালন করি। সংবিধানের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরার বা মনে করিয়ে দেওয়ার আগে অজানা কিছু বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো যা জানা গুরুত্বপূর্ণ।

Constituent Assembly বা সাংগঠনিক সভার প্রস্তাব প্রথম করেন এম এন রায় (মানবেন্দ্র নাথ রায়) তাঁর প্রকাশিত জার্নালে। স্বাধীন ভারত-এর অবশ্যম্ভাবী উদ্ভব এবং তারই প্রয়োজনে সংবিধান রচনার প্রয়োজন যা তিনি অনেক আগে থেকেই আভাসিত করে আসছিলেন বিদেশে থেকেই। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য অস্ত্র সন্ধানে তিনি যখন দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ব্রিটিশ আমেরিকান গোয়েন্দা দপ্তরের তাড়নায়, তখন মেক্সিকোতে তাঁর দ্বারা রাশিয়ার বাইরে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনের সংবাদে অভিভূত লেনিনের আমন্ত্রণে এম এন রায় রাশিয়া যান। ১৯২০ সালে কমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেন। সেখানে তাঁর পাণ্ডিত্য, কর্মকুশলতা ও ব্যক্তিত্বের জোরে তিনি অভূতপূর্ব সম্মান পান এবং আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন প্রচারের বিশেষ দায়িত্ব পান। সুপ্রিম সোভিয়েতে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে অভিষিক্ত হন। সেই সময় জেনেভা থেকে প্রকাশিত একটি পুস্তিকা 'What do we Want' গোপনে ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। ওই পুস্তিকাতেই আভাসিত ছিল ভারতের জন্য কী অধিকার চাই, কী আইন চাই, কী সুরক্ষা চাই, কৃষক শ্রমিক সাধারণ মানুষের অর্থাৎ যে বিবেচনাগুলি একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সংবিধানে থাকা চাই। পুস্তিকাতে ছিল— "...আমরা চাই যুক্তি, স্বরাজ...ভারতের কৃষক জমি চষে বীজ বোনে, মাসের পর মাস ফসল আগলে রাখে, বড় করে পাকায়, তারপরেই চলে ভাগ বাঁটোয়ারা, জমিদারের খাজনা, সরকারের কর, মহাজনের সুদ, গোমস্তা মুহুরির অঘোষিত পাওনা। সারা বছর পেটের চিন্তা— এই অসহনীয় অবস্থার পরিবর্তন চাই। স্বরাজ যেন এমন ব্যবস্থা নেয় যাতে কৃষকের উৎপন্ন ফসল জমিদার, মহাজন ব্যবসাদারদের আরও বড় লোক না করে কৃষকের থাকে, শহরে শ্রমিকের উৎপন্ন পণ্যের লাভ বেড়েই চলেছে শ্রমিকদের অনশনক্লিষ্ট রেখে। এ এক ধরনের দস্যুতা, এই দস্যুতার অবসান চাই। স্বরাজের অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের মধ্যে প্রাথমিক পালনীয় কর্তব্য হবে— (১) সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, (২) উৎপাদনের প্রধান উপায় সমূহ বিশেষত জমি, খনি, কলকারখানা রেলওয়ে, জলযান ব্যবস্থা প্রভৃতি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সম্পত্তি হবে— এসব সংস্থা শ্রমিকদের নির্বাচিত কাউন্সিল দ্বারা পরিচালিত হবে, বণ্টন ব্যবস্থা যেন সরকারের হাতে থাকে ইত্যাদি। অর্থাৎ সংবিধানে যা কাম্য তা সবেরই আভাস ছিল ওই পুস্তিকায়। পরবর্তীকালে ভারতে এসে সংবিধান রচনার জন্য Constituent Assembly-র প্রস্তাব তিনিই দেন, পরে সংবিধানের এক খসড়াও তিনি প্রস্তুত করেন। রাশিয়ায় স্টালিনের সঙ্গে মতভেদের জেরে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। উল্লেখ্য, করাচী কংগ্রেস অধিবেশনে ১৯৩১ (২৯, ৩০,৩১ মার্চ) করাচিতে জনৈক ব্যানার্জীর জন্য নির্দিষ্ট তাঁবুতে 'ব্যানার্জী' নামধারীর ছদ্মবেশে যিনি এসেছিলেন তিনি এম এন রায়। মৌলিক অধিকারের খসড়াটি ছিল তাঁরই রচনা। এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কি বর্তমান প্রজন্ম জানে?

খসড়া সংবিধান তৈরি করার সময় বিশ্বের অন্য যে সব রাষ্ট্রের চলমান সংবিধানগুলি বিবেচিত হয়েছিল সেগুলি হলো— (১) ব্রিটেন, (২) অস্ট্রেলিয়া, (৩) যুক্তরাষ্ট্র, (৪) ফ্রান্স, (৫) কানাডা, (৬) আয়ার্ল্যান্ড এবং (৭) সোভিয়েত ইউনিয়ন। সাংগঠনিক সভার সংবিধানের খসড়া তৈরি করতে সময় গিয়েছিল দু'বছর এগারো মাস সতেরো দিন। খরচ হয়েছিল ৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। ৩৯৫টি ধারা এবং ৮টি তপশিল নিয়ে ২২ খণ্ডে ধৃত ছিল এই খসড়া সংবিধান। খসড়া থেকে গ্রহণযোগ্য সবিধানে উত্তরণের পর তা লিখিত হয় হিন্দি এবং ইংরাজিতে।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর অনুরোধে দিল্লি নিবাসী প্রখ্যাত স্বহস্তলিপিবিদ প্রেমবিহারী রায়জদা বিশেষ শর্তসাপেক্ষে রাজি হন লিখতে। শর্তটি ছিল সংবিধানের প্রতি পৃষ্ঠায় তাঁর নাম লেখা থাকবে এবং শেষ পৃষ্ঠায় তাঁর নামের সঙ্গে তাঁর পিতামহের নামও থাকবে। নেহরু এতে রাজি হয়েছিলেন। কাজটি সম্পূর্ণ হয়েছিল ছ' মাসে। ২৫৪টি কলম এবং ৩০৩টি কলমের নিব লেগেছিল। লেখা শেষ হলে Constituent Assembly-র প্রতিটি সদস্যর সই ছিল তাতে। ১১ পৃষ্ঠা জুড়ে এইসব সই ছিল, শেষে সইটি ছিল ফিরোজ গান্ধীর। মূল

সংবিধানের প্রতিটি পৃষ্ঠা শান্তিনিকেতনের প্রথিতযশা শিল্পীরা বিশেষ করে নন্দলাল বসু প্রমুখ সুশোভিত করেছিলেন। আমাদের জাতীয় জ্ঞান ও সংস্কৃতির পরিচয় বহনকারী চিত্র দ্বারা সংবিধানের পৃষ্ঠাগুলি শোভিত হয়েছিল। সংবিধানের পৃষ্ঠাগুলির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছবি হলো অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনকারী রাম, সীতা, লক্ষ্মণের ছবি, কৃষ্ণের গীতা উপস্থাপনের ছবি, ভারতীয় ইতিহাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ছবি যেমন বুদ্ধ ও মহাবীরের জীবনচর্যার ছবি, আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে নেতাজীর ছবিও। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে সাধারণ্যে উপস্থাপিত 'সংবিধান'-এ ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচয়বাহী ছবিগুলি ছিল অনুপস্থিত— এমনকী নমুনা হিসেবেও কোনো ছবি নেই। কোনো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মহলের চাপেই কি পরবর্তী প্রজন্মগুলিকে এইসব জাতীয় পরিচিতি বহনকারী ছবিগুলি থেকে আড়াল করে রাখা হয়েছে? যাদের চাপে ও অসদুদ্দেশ্য সাধনে সংবিধানের মূল উদ্দেশিকাকে সংশোধন করা হলো, ৪২তম সংবিধান সংশোধনে তাদের চাপেই কি এই ছবিগুলিকে আড়াল করা হয়েছিল? আজ এ ব্যাপারে ভাবা দরকার।

হস্তলিখিত এবং সুশোভিত এই সংবিধান নতুন দিল্লির সংসদভবনে 'হিলিয়াম আধার'-এ সংরক্ষিত আছে। সংবিধানের ফটোলিখিত গ্রাফ অনুলিপি তৈরি হয়েছিল দেরাদুনের Survey of India Office-এ। ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ সালে সংবিধান গৃহীত হবার পর আজ অবধি সংশোধনী হয়েছে মোট ১২০ টি। প্রথম সংশোধনীটি হয় ১৯৫১ সালে। ৫২তম সংশোধন হলো একমাত্র সংশোধনী যা সংসদে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। সংশোধনীগুলির মধ্যে সবচাইতে বিতর্কিত ছিল ৪২তম সংশোধন।

১৯৭৬ সালে গৃহীত এই সংশোধনীর বলে Preamble বা উদ্দেশিকা পরিবর্তিত হয়। সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র থেকে ভারতের রাষ্ট্রসংজ্ঞা হয়ে যায় সার্বভৌম সমাজতন্ত্রী ধর্মনিরপেক্ষ (?) বা সেকুলার গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র। জাতির একতা (Unity of nation) পরিচিত হয় জাতির একতা এবং অখণ্ডতা (Unity and integrity of nation)। ৫৯টি দফা বা clause নিয়ে এই সংশোধনীটি নিজেই একটি ক্ষুদ্রায়িত সংবিধানে পরিণত হয়। সংবিধানের মূল ধরে টান দেওয়া অর্থাৎ উদ্দেশিকার পরিবর্তন করাটা অনেকেই মেনে নিতে পারেনি। কারণ এটি জরুরি অবস্থার সময় ঘোষণা করে করা হয়েছিল। ক্রমশ জনসমর্থন হারানো কংগ্রেস দেশীয় ও আন্তর্দেশীয় সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সমর্থন লাভ করার জন্য এই সংশোধনী আনে। স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার প্রতি চরম আঘাতের ফলস্বরূপ দেশব্যাপী আন্দোলন ও বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল যার ফলে জরুরি অবস্থার (২৫ জুন ১৯৭৫—২১ মার্চ ১৯৭৭) পর সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস পরাস্ত হয়। মূল উদ্দেশিকাটি ভারতীয় সুপ্রাচীন ধর্মনিরপেক্ষতা ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার আদর্শে রচিত হয়েছিল। এক সময় ১৯৪৬ সালে কে.টি. শার প্রস্তাব ছিল সেকুলার ফেডারেল অ্যান্ড সোসাইটি। রাষ্ট্রর জন্য এই প্রস্তাব অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত বলে আপত্তি জানিয়ে ছিলেন সংবিধান রচনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ড. বি. আর আম্বেদকর। আম্বেদকর জানিয়েছিলেন, "My objections stated briefly are two. In the first place the Constitution is merely a mechanism for the purpose of regulating the work of the various organs of the state. It is not a mechanism whereby particular members or particular parties are installed in the office. What should be the policy of the state, how the Society should be organised in its social or economic side are matter which must be decided by the people themselves according to time and circumstances. It can not be laid down in the constitution itself, because that is destroying democracy altogether. If you state in the constitution that the social organisation of the state shall take a particular form, you are, in my judgement taking away the liberty of the people to decide what should be the social organisation in which they wish to live. It is perfectely possible today, for the majority people to hold that the Socialist organisation of Society is better than the capitalists organisation of Society. But it would be perfectly possible for the thinking people to deceise some other form of social organisation which might be better than the socialis organisation of today or twomorrow. I do not see therefore why the constitution should tie down the people go live in a particular form and not deace to the people themselves to decide it for themselves. This is a reason why the amendment should be opposed." [Constituent Assembly of India Vol. VII] জনতা সরকার এসে ৪৩তম (১৯৭৭) ও ৪৪তম (১৯৭৮) সংশোধনী আইন প্রাক ১৯৭৬ সালে অবস্থা ফেরানোর জন্য। পাঠ্যপুস্তকে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যে উদ্দেশিকা দেখানো হয় ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর থেকে গৃহীত বলে তা কি সত্যের অপলাপ বা জালিয়াতি নয়?

২৬ নভেম্বর, ১৯৪৯ সালে, Secular, Socialist কথা ছিল? আগের Preamble-এ Secularism, Social Justice-এর কথা ছিল in spirit, not in language আর এখন সেগুলি আছে in language not in spirit. তাই এত ব্যাভিচারের উদ্ভব, দেশ জুড়ে। আমাদের অবশ্যই এ নিয়ে ভাবতে হবে। ■

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না

স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম

চির পরিচিত
দুলালের ®
তালমিছরি

আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান — দারুণ কাজ দেবে।

ভারত সরকারের R ® চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন

দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী

দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

গণতান্ত্রিক ভারতকে শরিয়তি ভারত বানানোর চক্রান্ত ব্যর্থ করতে হবে

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

অতি সম্প্রতি এই রাজ্যে দুটি ঘটনা ঘটেছে। একটি উত্তর চব্বিশ পরগনার দত্তপুকুরে। অন্যটি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সাগরদ্বীপে। দত্তপুকুরে একদল হিন্দু পুরুষ-রমণী বনভোজন সেরে ফেরার পথে গাড়িতে রামনামের ক্যাসেট বাজাচ্ছিল। চাকলা ছাড়িয়ে কিছুদূর এগোনোর পর একদল মুসলমান তাদের গাড়ি আটকায় এবং ওই রামনামের ক্যাসেট বন্ধ করতে বলে। হিন্দু যুবকরা তাতে রাজি না হওয়ায় তাদের গাড়ি থেকে নামিয়ে মারধর করা হয়। এর প্রতিবাদে পরদিন দত্তপুকুর রেল স্টেশন অবরোধ করে স্থানীয় হিন্দু বাসিন্দারা। সাগরদ্বীপে গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে রাজস্থান থেকে আসা একদল তীর্থযাত্রীকে স্থানীয় একদল মুসলমান হুমকি দেয়। ওই তীর্থযাত্রীদের বলা হয়— 'এটা বাংলাদেশ। এখানে তীর্থ করতে আসা চলবে না। এখান থেকে চলে না গেলে কুপিয়ে খুন করা হবে।' প্রাণভয়ে ওই তীর্থযাত্রীরা সাগরদ্বীপ থেকে পালিয়ে কোনো মতে ওড়িশা সীমান্তে গিয়ে আশ্রয় নেন। এ রাজ্যের সংবাদমাধ্যমে এই ঘটনা দুটি সেভাবে প্রকাশিতই হয়নি। সাগরদ্বীপের ঘটনাটি চেপে যাওয়া হয়েছে। এবং দত্তপুকুরের ঘটনাটি সত্য আড়াল করে আংশিক প্রকাশ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হতে পারে— ভারতীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের সঙ্গে এই ঘটনাগুলির সম্পর্ক কী? আপাতদৃষ্টিতে, ওপর ওপর কেউ যদি ভাবেন— ভারতের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এইসব প্রসঙ্গের অবতারণা করা অবান্তর, তাহলে বলব, তাঁদের আরও একটু গভীরে গিয়ে ভাবতে হবে। যেমন, আরও কিছু ঘটনার উল্লেখ করা যেতেই পারে। এদেশের একটি আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয়, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে একদল বাম ও অতি বামপন্থী ছাত্র-শিক্ষক এক ইসলামি জঙ্গির স্মরণে শোকমিছিল করলেন। ওই মিছিলে আওয়াজ উঠল 'ভারতকে হাজার টুকরো করে দাও।' আওয়াজ উঠল, 'কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি, মণিপুর মাঙ্গে আজাদি।' এই মিছিলে নেতৃত্বপ্রদানকারী এক ছাত্রনেতার সঙ্গে জোট বেঁধে গুজরাটে নির্বাচনের আগে দলিত আবেগ ভাঙিয়ে রাজনীতি শুরু হলো। গুজরাটের ভোটপর্ব মিটতে না মিটতেই সেই দলিত আবেগ ভাঙিয়ে হিংসাত্মক কার্যকলাপ ঘটানোর চেষ্টা হলো কয়েকটি রাজ্যে। পাঠকের নিশ্চয়ই স্মরণ থাকবে— এই দেশের এক প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি জাতীয় পতাকাকে যথাযথ সম্মান জানাননি। উপরাষ্ট্রপতি পদ হারানোর পর তিনি প্রকাশ্যে বলেছিলেন— ভারতে মুসলমানরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। দীর্ঘদিন দেশের শাসন ক্ষমতায় থাকা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এক প্রথম সারির নেতা পাকিস্তান সফরে গিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে মন্তব্য করে এসেছিলেন। এই রাজ্যের এক মুসলমান ধর্মগুরু বুক ঠুকে বলেছিলেন— 'আমরা আটাশ শতাংশ। আমরাই ঠিক করব কে এখানে সরকার গড়বে।' এ রাজ্যেই ঘটে যাওয়া কালিয়াচক বা ধুলাগড়ের ঘটনা এবং তৎপরবর্তীতে রাজ্য সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণ নিশ্চয়ই ভুলে যাননি পাঠক। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝবেন— এর কোনোটিই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এই সবকটি ঘটনাই একটি সূত্রে বাঁধা, একটি সুগভীর আন্তর্জাতিক চক্রান্তের অংশ। এবং এই চক্রান্তটির একটিই লক্ষ্য— তা হচ্ছে, এদেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোটিকে ধ্বংস করা।

কীভাবে? এই ধরনের ঘটনা যারা ঘটাচ্ছে এবং এই ধরনের মানসিকতার প্রকাশ যারা করছে— তারা এই দেশে কাদের পায়ের তলার জমি শক্ত করছে এবং কাদের স্বার্থকে রক্ষা করছে তা একটু খতিয়ে দেখা ভালো। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই ভারতবর্ষ তার প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের হিংসার শিকার। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই পাক সেনাবাহিনী কাশ্মীর আক্রমণ করে এবং কাশ্মীর ভূখণ্ডের বেশকিছু অংশ দখল করে। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর অবিমৃশ্যকারিতার দরুন সেই সময় ভারতীয় সেনা ওই পাক-অধিকৃত কাশ্মীরকে দখলমুক্ত করতে পারেনি। আজও সেই অংশটুকু পাক-অধিকৃত কাশ্মীরই রয়ে গিয়েছে। এই প্রসঙ্গটি নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করতে চাইছি না। কিন্তু এর পরেও বেশ কয়েকবার পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। প্রতিবারই পর্যুদস্ত হলেও পাকিস্তানের লক্ষ্য একটিই ছিল। তা হচ্ছে, আঘাতে আঘাতে ভারতকে বিপর্যস্ত করে তোলা। এগুলি হচ্ছে সম্মুখ সমরের কথা। কিন্তু বিগত সত্তর বছর ধরেই পাকিস্তান এবং তার মদতপুষ্ট ইসলামিক মৌলবাদী জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি ভারতের বিরুদ্ধে ছায়াযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রে ভারতীয়

জনতাপার্টির সরকার ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর গত চার বছরে পাকিস্তান এই ছায়াযুদ্ধকে আরও চড়া মাত্রায় নিয়ে গিয়েছে। এই ছায়াযুদ্ধেরও আবার দুটি ধরন রয়েছে। এক, কাশ্মীর সীমান্তে মাঝে মাঝেই ভারতীয় সেনার ওপর হামলা চালাচ্ছে পাক বাহিনী। ভারতীয় সেনাও অবশ্য তার পাল্টা জবাব দিচ্ছে। এই হামলাও কিন্তু ক্রমশ বাড়ছে। এবং একটু খতিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে কাশ্মীর সীমান্তে ভারতীয় সেনাকে ব্যতিব্যস্ত রাখাই পাকিস্তানের অন্যতম উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দ্বিতীয়ত, আর একটি কাজও পাকিস্তান ক্রমাগতই করে যাচ্ছে। তা হলো— অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে ইসলামিক মৌলবাদী জঙ্গিদের ভারতে অনুপ্রবেশ ঘটানো এবং একই সঙ্গে ভারতে অবস্থিত ইসলামিক মৌলবাদী জঙ্গিদের হাতে চোরাপথে অস্ত্র তুলে দেওয়া। সাম্প্রতিক বেশ কিছু ঘটনাতে পাকিস্তানের সঙ্গে এই জঙ্গি যোগ প্রমাণ হয়ে গিয়েছে।

চেনা শত্রুকে চেনা অনেক সহজ। কিন্তু অচেনা শত্রুকে? শত্রু যদি বন্ধুর ছদ্মবেশে ঘরেই আত্মগোপন করে থাকে? পাকিস্তান কিন্তু নিপুণভাবে সে কাজটিও সম্পন্ন করে ফেলেছে। এক্ষেত্রে ইতিহাসের একটি পর্ব একটু স্মরণ করে নেওয়া ভালো। কেরলে মোপালা মুসলমানরা স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে হিন্দু নিধন চালিয়েছিল। দেশভাগ পর্বে এই মোপালা মুসলমানরা মহম্মদ আলি জিন্নাহর কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছিল--- কেরলকেও পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির দাবি আপনি তুলুন। জিন্নাহ তাদের একটি পরামর্শ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আপনাদের পাকিস্তানে যাওয়ার দরকার নেই। বরং, আপনারা ভারতের ভিতরে থেকে, ভারতের বিপর্যস্ত করে, তাকে ভিতর থেকে ভেঙে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। তাতেই পাকিস্তানের লাভ হবে। সাত দশক ধরে এদেশের অন্ন-জলে প্রতিপালিত হিন্দু বিদ্বেষী মৌলবাদী মুসলমানরা জিন্নাহর সেই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গিয়েছে। পাকিস্তান এটুকু উপলব্ধি করেছে যে, সম্মুখ রণাঙ্গনে ভারতকে মোকাবিলা করার ক্ষমতা তাদের নেই। অতএব ভারতের ভিতরেই তাদের অনুগ্রহধন্য গোষ্ঠী তৈরি করতে হবে, যারা ভারতীয় গণতন্ত্রের সমান্তরাল শরিয়তি শাসন কায়েম করবার চেষ্টা করবে এই রাজ্যে। মনে রাখতে হবে, শরিয়তি শাসন ব্যবস্থা হচ্ছে সেই শাসন ব্যবস্থা যা কোনোরকম গণতান্ত্রিক ভাবনাকেই শ্রদ্ধা করে না। মান্যতা দেয় না।

এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ইরানি সমাজতাত্ত্বিক আলি সিনা-র পর্যবেক্ষণ একটু তুলে ধরা যাক। বিভিন্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই ইসলামিক মৌলবাদের প্রভাব বিস্তারের প্রসঙ্গটি আলোচনা করতে গিয়ে আলি সিনা বলেছেন— বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরে এই ইসলামিক মৌলবাদী শক্তিগুলির প্রভাব বিস্তারের একটি নিজস্ব কৌশল রয়েছে। প্রতিটি দেশেই প্রথমে তারা পেশার কারণে বা অন্যান্য ছল করে এসে বসবাস শুরু করে। ক্রমে নাগরিকত্ব গ্রহণ করে। এবং এক সময় নিজেদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে যখন সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রতিপত্তি খাটানোর জায়গায় পৌঁছয়—তখনই আসল রূপটি প্রকাশ করে। একদম যথার্থ পর্যবেক্ষণ। সমগ্র ভারতের দিকেও তাকাতে হবে না। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকান। এই পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনতার সাত দশক অতিক্রান্ত হওয়ার পর কিন্তু একজন মুসলাম ধর্মগুরু বুক ঠুকে বলেন— 'আমরা আটাশ শতাংশ আমরাই ঠিক করব কে এখানে সরকার গঠন করবে।' আর এটাকে শুধু মুখের কথা ভাবলে ভুল হবে। হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধতার অভাব এবং বিপরীতে মুসলমানদের সঙ্ঘবদ্ধতার কারণে, এই আটাশ শতাংশ কিন্তু বাস্তবিক অর্থেই সরকার গঠনে নির্ধারক শক্তি হয়ে উঠেছে। আর দেখুন, যখনই এরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নির্ধারক শক্তি হয়ে ওঠে, তখনই কালিয়াচক, দেগঙ্গা, ধুলাগড়, ক্যানিংয়ের মতো ঘটনাগুলি ঘটে। তখনই, বিভিন্ন মফস্‌সল শহর এবং গ্রামে হিন্দু মন্দির এবং বিগ্রহগুলির উপর আক্রমণ শুরু হয়। হিন্দুদের নানাবিধ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উপর বিধিনিষেধ আরোপের চেষ্টা হয়। শুরু হয়ে যায় ভারতীয় সংবিধান এবং আইন ব্যবস্থাকে প্রকাশ্যে অবমাননা এবং অবজ্ঞা করা। আমি ব্যক্তিগত ভাবে মালদহ এবং মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে ঘুরতে গিয়ে দেখেছি— ওইসব গ্রামে মোল্লা-মৌলবিদের হুমকিতে শরিয়তি শাসন শুরু হয়ে গিয়েছে। মুর্শিদাবাদ, মালদহের বহু গ্রামে হিন্দুরা বাড়িতে আলপনা দিতে পারে না, শাঁখ বাজাতেও পারে না। নদীয়া জেলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও হিন্দু মন্দির এবং পূজামণ্ডপে মাঝে মাঝেই হামলার ঘটনা ঘটে। মালদা, মুর্শিদাবাদের বহু সীমান্ত ঘেঁষা গ্রাম থেকে হিন্দুরা নিরাপত্তার অভাবে জমিজমা বিক্রি করে পালিয়ে এসেছে। এইসব গ্রামগুলি এখন মুসলমান প্রধান। মালদহ এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় বহুদিন আগেই হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়েছে। নদীয়াও সে দিকেই এগোচ্ছে। রাজ্যের অন্য জেলাগুলিতেও মুসলমান জনসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক ভারসাম্যের দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। এখানে উল্লেখ করা ভুল হবে না যে, কয়েকবছর আগে মুর্শিদাবাদ জেলায় এক মুসলমান জেলাশাসকের কার্যকালের সময়ে জেলা শাসকের দপ্তরের একটি সার্কুলারে মুর্শিদাবাদ জেলার নাম 'মুসলমানাবাদ' লেখা হয়েছিল। পরে অবশ্য জেলাশাসকের দপ্তর বলে এটি নাকি ছাপার ভুল। কিন্তু ছাপার ভুলে মুর্শিদাবাদ কী করে মুসলমানাবাদ হয়ে যায়— তার কোনো সদুত্তর মেলেনি। অবস্থা এখন এমনই যে বারো-চোদ্দটি মুসলমান মৌলবাদী সংগঠন একত্র হয়ে কলকাতার রাস্তায় প্রকাশ্যে সভায় উত্তেজক কথাবার্তা বললেও তা প্রতিরোধ করার সদিচ্ছা রাজ্য সরকার দেখাচ্ছে না।

সমগ্র ভারতেই কিন্তু এখন এই সামাজিক ভারসাম্য বদলের এক আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি ইন্সটিটিউট অব ওয়ার্ল্ড ডেমোগ্রাফির একদল গবেষক ভারতে ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যার

যে চিত্রটি তুলে ধরেছেন, তাতে এই আশঙ্কা আরও সুদৃঢ় হয়েছে। এরা দেখিয়েছেন, ২০১১ সালে প্রস্তাবিত হারে এদেশে হিন্দু জনসংখ্যা হওয়ার কথা ছিল ৭৯.৮ শতাংশ। আর মুসলমান জনসংখ্যা ১৫ শতাংশ। কিন্তু বাস্তব (সরকারি তথ্য অনুযায়ী) হলো হিন্দু জনসংখ্যা এখন ৭৩.২ শতাংশ। মুসলমান ২২.৬ শতাংশ। অর্থাৎ মুসলমান জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি ৭.৬ শতাংশ। এই গবেষকদের হিসাবে ২০৩১ সাল নাগাদ ভারতে হিন্দু জনসংখ্যা হবে ৬০.৪ শতাংশ। আর মুসলমান জনসংখ্যা হবে ৩৮.১ শতাংশ। এই গবেষকরা বলছেন এভাবে চললে ২০৪০ সাল নাগাদ ভারতে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়বে। তখন হিন্দু জনসংখ্যা হবে ১১.২ শতাংশ। আর মুসলমান জনসংখ্যা ৮৪.৫ শতাংশ। তখন ভারতে অবশ্যম্ভাবীভাবে চালু হয়ে যাবে শরিয়তি আইন। যেখানে গণতন্ত্রের কোনো স্থানই থাকবে না। ইতিমধ্যেই মুসলমান মৌলবাদী সংগঠনগুলি হুমকি দিয়েছে আগামী কুড়ি বছরের মধ্যে তারা ভারতকে ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করবে। অসমে যে নতুন করে নাগরিক পঞ্জিকরণ শুরু হয়েছে তার একটি বড় কারণ, ওখানে এভাবেই বিপন্ন হয়ে পড়ছিল সামাজিক এবং রাজনৈতিক ভারসাম্য। সেই সঙ্গে বিপন্ন হয়ে পড়ছিল অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার বিষয়টিও।

এবার আবার ফিরে আসি লেখার শুরুর অংশে। পাঠক এবার একটু মিলিয়ে দেখুন যে যে ঘটনাগুলি সম্প্রতি ঘটেছে, যারা ঘটিয়েছে এবং যারা এসব ঘটনায় পরোক্ষ সমর্থন জুগিয়েছে— তারা ভারতে গণতন্ত্রের পরিবর্তে কোন ব্যবস্থা কায়েম করতে চাইছে? কেউ যদি বলে ভারতবর্ষে রামনাম করা যাবে না, কেউ যদি বলে এই বাংলার ছেলে-মেয়েরা স্কুলে সরস্বতী পুজো করতে পারবে না, কেউ যদি বলে বাংলার গ্রামেগঞ্জে শঙ্খধ্বনি করা যাবে না, কেউ যদি বলে হিন্দুর ধর্মাচরণের অধিকার থাকবে না এই বাংলায়, যদি বলে এই সাগরদ্বীপ ভারতের অংশ নয়, যদি মুর্শিদাবাদকে মুসলমানাবাদ বানাতে চায়— তাহলে তারা কি ভারতের সংবিধানকে অমান্য করে না? ভারতের সংবিধানে সবার ধর্মাচরণের অধিকারকে পদদলিত করে শরিয়তি শাসন ব্যবস্থার মুসলমান মৌলবাদ চাপিয়ে দিতে চায় না? কেউ যখন পাকিস্তানি জঙ্গির সমর্থনে মিছিল করে ভারতকে হাজার টুকরো করে দেওয়ার আওয়াজ তোলে— তখন কি সে কার্যত পাক মদতপুষ্ট জঙ্গির ভূমিকাই পালন করে না? জাতপাতের জিগির তুলে যে সমগ্র দেশে আগুন জ্বালাতে চায়— সে কি গণতান্ত্রিক কাঠামোটিই আসলে ধ্বংস করতে চায় না? ভারতের গণতন্ত্রের পক্ষে, ভারতের অখণ্ডতা এবং স্থিতির পক্ষে এরাই সবথেকে বিপজ্জনক। গণতন্ত্রকে রক্ষার লড়াইটা এদের বিরুদ্ধেও লড়তে হবে। সীমান্তে পাকিস্তানি হানাদারদের ঠেকানোর জন্য আমাদের সেনাবাহিনী মজুত আছে। তাঁরা জীবন দিয়ে হলেও আমাদের গণতন্ত্র, আমাদের সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করবেন। কিন্তু দেশের ভিতরে এই দেশবিরোধী শত্রুদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক এবং সামাজিকভাবে লড়াই করতে হবে দেশবাসীকেই। ভারতের গণতন্ত্রকে রক্ষা করার দায় প্রতিটি দেশভক্ত ভারতবাসীর। শরিয়তি ভারত নয়, গণতান্ত্রিক ভারতই হবে এদেশের শাশ্বত শক্তি— এই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হতে হবে প্রতিটি দেশভক্ত ভারতীয়কেই।

দায়িত্বজ্ঞানহীন বিরোধিতা গণতন্ত্রের অশনিসংকেত

অম্লানকুসুম ঘোষ

দেখতে দেখতে আমাদের ভারতবর্ষের গণতন্ত্র প্রায় সাত দশক অতিক্রান্ত করতে চলল। চলতে চলতে নিজের অতীতকে বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যতের পথ চলাকে নিয়ন্ত্রণ করা সবসময়েই জরুরি। বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজেকে এবং নিজের কাজকে সঠিকতর করে তোলা অবশ্য প্রয়োজনীয়। আমাদের রাষ্ট্রের গণতন্ত্রের মূল্যায়নের জন্যও অন্তর্বর্তী বিশ্লেষণ তাই অতীব প্রয়োজনীয়।

একজন মানুষ দু'পায়ের ওপর ভর করে হাঁটতে পারে, একটি পাখি তার দুই ডানার ওপর ভর করে তবে উড়তে সক্ষম হয়। সেরকমই একটি দেশের গণতন্ত্র সঠিক পথে চলতে সক্ষম হয় শাসক ও বিরোধীর ওপর নির্ভর করে। দেশের শাসকশক্তির যেমন উচিত গণতান্ত্রিক পথে চলে প্রয়োজনমাফিক দেশের সংবিধান সংশোধন করে দেশের আইন বদল করে দেশকে সঠিক রাস্তায় নিয়ে চলা। সেইরকমই বিরোধী শক্তির উচিত দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী কোনও বিষয়ের বিরোধিতা এবং কোনও বিষয়ের সমর্থন করে দেশের উন্নতি এবং দেশের গণতন্ত্রের চলার পথ প্রশস্ত করা। সাত দশকের দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর যদিও বা দেশবাসী দায়িত্বশীল শাসক পেয়েছে কিন্তু দায়িত্বজ্ঞানহীন বিরোধীর একদেশদর্শী আচরণে দেশবাসী দিগ্‌ভ্রান্ত হচ্ছে। এ যুগের বিরোধীরা এককালে শাসক হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সংবিধান পরিবর্তন করেছে বারংবার। সে সমস্ত পরিবর্তন দেশের উপকারের বদলে অপকারই করেছে বেশি কিন্তু আজ বিরোধীর আসনে বসে তারা বর্তমান শাসকদের যে-কোনও সংবিধান সংশোধনীর বিরোধিতা করছে। যে সমস্ত সংবিধান সংশোধনী দেশের উপকার করবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল সকল মহলই, তাদেরও তারা বিরোধিতা করছে উচ্চকণ্ঠে এবং সেই বিরোধিতা অনেক ক্ষেত্রেই সংসদে না হয়ে হচ্ছে প্রকাশ্যে বশংবদ সংবাদমাধ্যমের সামনে। অর্থাৎ যেখানে বিরোধিতা করলে যৌক্তিক বিচারের সামনে পরে নিজেদের দুর্বলতা প্রকট হবার সম্ভাবনা, সেখানে, বিরোধিতা না করে বিরোধিতা করা হচ্ছে সেখানে যেখানে যুক্তির কথা কেউ মুখেও আনে না। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভস্বরূপ সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা সমপরিমাণে পক্ষপাতদুষ্ট, নিরপেক্ষতা বজায় রাখার মাধ্যমে যে সংবাদমাধ্যম এককালে গণতন্ত্রের রক্ষাকর্তা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে সেই সংবাদমাধ্যমই বর্তমানে নির্লজ্জভাবে নিজের অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়েছে পেট্রো-ডলারের লোভে। বিশেষ করে শিক্ষা- সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের মতো সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও এককালে সারা দেশকে পথ দেখিয়েছে বাংলার সংবাদমাধ্যম। অন্ধ মোদী-বিরোধিতা ছাড়া এদের আর কোনও কথা নেই। দেশের মুসলমান সমাজের মহিলাদের মধ্যযুগের বন্দিদশা থেকে মুক্তি দেওয়া তিন তালাক বিল বা দেশের দুর্নীতির ওপর চরম আঘাত হানা বিমুদ্রীকরণের সিদ্ধান্ত--- সব সদর্থক পদক্ষেপকেই বিরোধীরা নিশানা করেছে নির্মমভাবে এবং অযৌক্তিকভাবে। প্রচারমাধ্যমের ঢক্কানিনাদে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হয়নি। সেই সব কথাই নির্মল বাতাসের মতো পবিত্র গণতন্ত্র বিপন্ন হচ্ছে বিরোধীদের এই অপচেষ্টায়।

অনৈতিক ও স্বার্থান্বেষী জোটে সিদ্ধহস্ত বিরোধী এবং পেট্রো- ডলারের কাছে নিজেদের সত্তা বিক্রয়কারী প্রচারমাধ্যমের ব্যাপারে জনসাধারণ যত তাড়াতাড়ি সচেতন হতে পারে এবং তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। দেশের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার যে সমস্ত পদক্ষেপের দ্বারা দেশের উপকার করতে সচেষ্ট, নিজস্ব বিচারে সেই সমস্ত বিশ্লেষণ করে জনসাধারণের উচিত কেন্দ্রীয় সরকারকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করে গণতন্ত্রকে রক্ষা করা। ■

গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের অবক্ষয়ে ভারতীয় গণতন্ত্রের সঙ্কট সূচিত

অভিমন্যু গুহ

গণতান্ত্রিক কাঠামোয় সংবাদমাধ্যমের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। সংবাদমাধ্যমকে বলা হয় গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। স্বাধীন ভারতের যখন সংবিধান রচিত হয়েছিল তখন সংবিধান রচয়িতারা বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তা করেছিলেন। তাঁদের সামনে দু'টি উদাহরণ ছিল। প্রথমটি আমেরিকান গণতন্ত্র, যেখানে সংবাদমাধ্যমের জন্য স্বতন্ত্র গণতান্ত্রিক কাঠামোর ব্যবস্থা রয়েছে; আর দ্বিতীয় উদাহরণটি হলো ইংলন্ডের গণতন্ত্র, যেখানে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা মানে কথা বলা ও ভাব প্রকাশের মৌলিক অধিকার স্বীকৃত। আমাদের গণতান্ত্রিক কাঠামোর রচয়িতারা ইংলন্ডের গণতন্ত্র থেকেই ধার নিলেন। সংবিধানের ১৯/১/এ ধারায় সংবাদমাধ্যমের যে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার কথা বলা রয়েছে তা আসলে ওই কথা বলা ও ভাব প্রকাশের অধিকার মাত্র।

স্বাধীনতার সত্তর বছর পর ভারতের সাংবিধানিক কাঠামোর কিছু জরুরি অদলবদলের প্রয়োজনীয়তার কথা সংবিধান-বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। আমাদের সাম্প্রতিক মাথাব্যথার কারণ কিছু সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা। সরকারি সিদ্ধান্ত অপছন্দ হলে তার বিরোধিতা করা আমাদের সাংবিধানিক অধিকারের মধ্যেই পড়ে। কিন্তু সরকারের বিরোধিতার আড়ালে তা যদি দেশ-বিরোধিতায় পরিণত হয়? একটা ছোট্ট উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন আফজল গুরুর মৃত্যুবার্ষিকী পালন নিয়ে দেশজোড়া বিতর্কের ঝড় উঠেছিল, তখন কলকাতার একটি দৈনিকের উত্তর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে একজন ব্যঙ্গ করে লেখেন

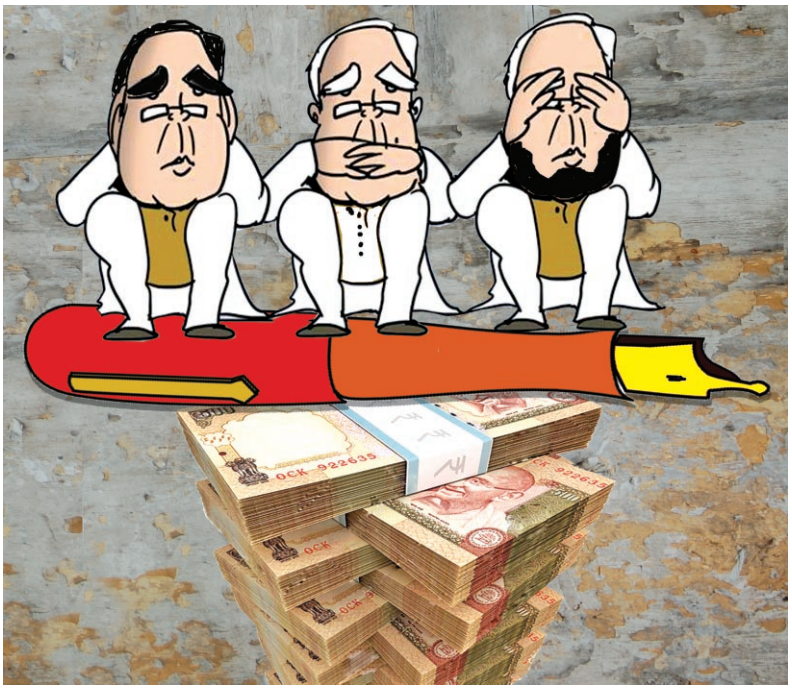

যে, মা (অর্থাৎ ভারতমাতা) যদি ভুল করে তবে কী সন্তান আঙুল তুলে বলতে পারে না মা ভুল করছে!

এই লেখা যতটা লঘুস্বরে লেখা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে বিষয়টা মোটেও তা ছিল না। আফজল গুরু আমাদের দেশের গণতন্ত্রের পীঠস্থান সংসদ ভবনে হামলা চালিয়ে ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিদের প্রাণে মারতে চেয়েছিল। দেশের সর্বোচ্চ আদালত তাকে ফাঁসির সাজা দিয়েছে এবং তৎকালীন কংগ্রেস সরকার সেই আদেশ কার্যকর করেছে। এই ধরনের দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ফাঁসির আসামির মৃত্যুবার্ষিকী পালন নিঃসন্দেহে দেশবিরোধী কর্ম হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্য। অথচ দেশবিরোধিতার পালে হাওয়া দিতে ও জনমত গঠন করতে একটি দৈনিক পত্রের সম্পাদকীয় সরাসরি বলছে এক্ষেত্রে ভারত ভুল করেছে অর্থাৎ দেশের সর্বোচ্চ আদালত আফজলকে ফাঁসি দিয়ে ভুল করেছে।

সংবিধানের ওপর এই আঘাত ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের একাংশ নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পর থেকেই করে চলেছে। কোনো লিফলেট হিসেবে ওই উত্তর সম্পাদকীয় লেখাটি প্রকাশিত হলে লেখকের ইউ এ পি এ ধারায় জেলযাত্রা নিশ্চিত ছিল। কারণ এই লেখা শুধুমাত্র ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে আঘাত করেনি, তা সন্ত্রাসবাদকেও প্ররোচিত করেছে। যেহেতু এটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত, তাই এমন দেশদ্রোহী লেখাটি স্রেফ কথা বলা ও ভাব প্রকাশের অধিকারের অছিলায় পার পেয়ে গেল।

বিশেষ করে জরুরি অবস্থার সময় প্রযুক্তিগত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও সংবাদমাধ্যমগুলি যে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছিল, তা আমাদের সংবিধানের ভবিষ্যৎকে আরও উজ্জ্বল করেছে। কিন্তু তারপর দু-এক দশকের মধ্যে ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে বিশাল বড়ো পরিবর্তন আসে।

একজন প্রবীণ সাংবাদিকের মুখে গল্প শুনেছিলাম যে বিয়ের সময় তাঁকে পাত্রীর বাবা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তাঁর সাংবাদিকতার চাকরির কথা শুনে। কারণ আর্থিক নিরাপত্তা এতে ছিল তো না-ই, এমনকী সংসার চালাতে হিমসিম খেতে হতো সংবাদমাধ্যমের বড়কর্তাদেরও। অথচ এখন সংবাদপত্রে চাকরিতে বড়ো জায়গায় পৌঁছলে পায়ের ওপর পা তুলে দিন কাটানোর মতো টাকার অভাব হয় না। টাকা এসেছে, কিন্তু আদর্শবাদ গিয়েছে। এখন প্রশ্ন, এই টাকার জোগান কোথা থেকে হয়। চিটফান্ড কাণ্ডের সময় এধরনের অনেকগুলি সংবাদমাধ্যম ছিল যারা সংবাদমাধ্যমের মুখোশ পরে চিটফান্ডের নুন খেয়ে বকলমে তাদের মদতদাতা সরকারের গুণ গেয়েছে।

চিটফান্ডের অবলুপ্তির সঙ্গে এদের সংবাদমাধ্যমগুলিরও অবলুপ্তি ঘটেছে। তবে এখন কিছু সংবাদপত্রের এই দেশবিরোধিতা কীসের স্বার্থে? বহুদিন ধরেই এই কাগজগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ এরা বিদেশের টাকায় পরিচালিত হয়। শুধু বাংলার কথা যদি ধরা, যায় তাহলে আর এস এস-এর আদর্শের বিরোধিতার কারণে অনেক সংবাদমাধ্যমই রয়েছে যারা নিত্য কেন্দ্রীয় সরকারকে গালাগাল করে। আমাদের সংবিধান কথা বলা ও ভাবপ্রকাশের অধিকার দিয়েছে। সেই অধিকারের বলে তারা এই কর্মটি করবার সুবিধা পায়। এতে যদিও সাংবিধানিক সংকটের কোনো কারণ নেই। কিন্তু খেয়াল করলে দেখা যাবে এ রাজ্যের একটি সংবাদপত্র-গোষ্ঠী যাদের দৈনিক থেকে বৈদ্যুতিন প্রচারমাধ্যম, এফ এম স্টেশন থেকে সাহিত্যপত্র সবকিছুই রয়েছে, তারা কেবল সাংবিধানিক অধিকারের বলে কেন্দ্রের বিরোধিতাই করছে না, দেশ- বিরোধিতাকে শিল্পের পর্যায় নিয়ে গিয়েছে। আফজল কাণ্ডে তাদের নক্কারজনক দেশদ্রোহিতার কথা সকলেরই অবগত। তাদের নিত্য-নৈমিত্তিক সম্পাদকীয়, উত্তর সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলো খেয়াল করলে দেখতে পাওয়া যাবে দেশদ্রোহীদের কীভাবে সেখানে প্রতি পদে ইন্ধন দেওয়া হচ্ছে। একটা সামান্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কুলভূষণ কাণ্ডে তাঁর মা ও স্ত্রীর প্রতি পাকিস্তানের অমানবিক, বর্বরোচিত আচরণের বিরুদ্ধে দেশের সংসদ যখন এককাট্টা; প্রতিটি সংবাদপত্রে সেই খবরও বেরিয়েছে— কিন্তু দেখা গেল এই সংবাদপত্রটি 'প্রশ্নে সরকারের পাক-নীতি' বলে অসত্য, মনগড়া, কাল্পনিক একটি সংবাদ প্রচার করছে। যে প্রচার উর্দুভাষী পাকিস্তানি বর্বরেরা বুঝতে পারলে যথেষ্ট উৎসাহিত হবে।

বিনা নুনে তারা গুণ গাইছে না— এটা একটা বাচ্চাছেলেও বুঝতে পারবে। এখন নুনের জোগানদার কে, সেটা চীন হোক, পাকিস্তান হোক, আরব-দুনিয়ার পেট্রোডলারই হোক বুঝতে না পারলে ভারতের সংবিধানের সংবাদমাধ্যমের কথা বলা ও ভাব প্রকাশের অধিকার কতটা লাঞ্ছিত হচ্ছে তা বোঝা যাবে না। এই সংবাদ-গোষ্ঠীর সাহিত্য পত্রিকাই বলুন কিংবা বৈদুতিন মাধ্যম, 'বুদ্ধিজীবী' নামধারী একদল বেতনভুক কর্মচারী রয়েছে যাদের কাজ হলো সরকার বিরোধিতার গণতান্ত্রিক অধিকারের নামে কৌশলে দেশবাসীর মনে দেশ- বিরোধিতার বীজ রোপণ করা। এই অবস্থায় আমাদের চিন্তা করবার প্রয়োজন রয়েছে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃত সংবাদমাধ্যমের নিরপেক্ষ ভূমিকার কথা না হয় বাদই দিলাম, কিন্তু দেশদ্রোহিতার আগাছাকে কীভাবে নির্মূল করা যায়। নচেৎ আগামীদিনে দেশ আরও বড় দুর্দিন দেখবে। বামপন্থী শিক্ষা-দীক্ষা-আদর্শের কারণে বাংলার সংবাদমাধ্যমগুলির অধিকাংশই ভারতীয়ত্ব তথা হিন্দুত্বের বিরোধী। আমাদের সাড়ে বত্রিশ-ভাজা সংবিধান থেকে এটুকুও না হয় যত কষ্টই হোক স্বীকার করে নেওয়া যায়, কিন্তু মুখোশের আড়াল থেকে দেশের খেয়ে দেশের পরে সেই দেশেরই দাড়ি ওপড়ানোর এই সর্বনাশা খেলা রোখা দরকার অবিলম্বেই। ২০১৬-য় বাম-কংগ্রেসের দালালি, '১৬-র পর থেকে আবার তৃণমূলের দালালি এসবের একটাই লক্ষ্য। বিজেপি বিরোধিতার নামে ভারতবর্ষের বিরোধিতা, নেহরুর ভারতের নামে দেশভাগের মর্মান্তিক ছবি, চীনের কাছে পরাজয়ের ছবি উসকে দেওয়া আর একবিংশ শতাব্দীতে শক্ত ভারত, সমর্থ ভারতকে জাতপাত ও ছদ্ম- ধর্মনিরপেক্ষতার মাধ্যমে টুকরো টুকরো ও দুর্বল করতে চাওয়া। এটা কখনো গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের দায়িত্ব হতে পারে না। এটা বরং পাকপন্থীদেরই যোগ্য কাজ। ■

বিজেপি বিরোধিতার নামে ভারতবর্ষের বিরোধিতা, নেহরুর ভারতের নামে দেশভাগের মর্মান্তিক ছবি, চীনের কাছে পরাজয়ের ছবি উসকে দেওয়া আর একবিংশ শতাব্দীতে শক্ত ভারত, সমর্থ ভারতকে জাতপাত ও ছদ্ম- ধর্মনিরপেক্ষতার মাধ্যমে টুকরো টুকরো ও দুর্বল করতে চাওয়া— এটা কখনো গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের দায়িত্ব হতে পারে না। এটা বরং পাকপন্থীদেরই যোগ্য কাজ।

পশ্চিমবঙ্গের শাসকের স্বৈরাচারী মানসিকতা শুধু 'গণতন্ত্রের সঙ্কট' নয়, সংবিধানেরও সঙ্কট

অমলেশ মিশ্র

পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের সঙ্কট বলে সাধারণত আমরা যা উল্লেখ করি বা রাজনৈতিক নেতারা উল্লেখ করেন— তাকে ঠিক গণতন্ত্রের সঙ্কট বলা যায় না। একে সংবিধানের সঙ্কট বলাই সমীচীন। এই রাজ্যে সমস্যাটা মৌলিক অধিকার রক্ষার সমস্যা। গণতন্ত্রের সঙ্কট নামে এই সমস্যাকে অভিহিত করলে সঙ্কটটির গুরুত্ব কমে যায়।

সংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে আইনের চোখে সমানাধিকার একটি মৌলিক বিষয়। সংবিধানের ১৪নং ধারায় (মৌলিক অধিকার অধ্যায়, সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়) equality before the law or equal protection of the law (আইনে সমান অধিকার, সমান সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার)-এর কথা বলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সরকার বিরোধী ব্যক্তি বা সংগঠনগুলি সংবিধানের এই অধিকার ভোগ করতে পারে না, যেহেতু সরকার তা ভোগ করতে দেয় না।

এই কারণেই সরকারি দল যে স্থানে সভা ও নৃত্য করতে পারে, অন্য দল পারে না। সরকারি দলের ব্যক্তিরা যে চাকরি পায়, অন্যে তা পায় না। ফলে বিষয়টি গণতন্ত্র রক্ষার বিষয় নয়, সংবিধানকে মেনে চলার বিষয়। একই যোগ্যতা এমনকী অধিক যোগ্যতার মানুষ সেই সুযোগ বা পুরস্কার পান না, যা সরকার সমর্থকরা পেয়ে থাকেন।

পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের সঙ্কট যতটা তার থেকে অনেক বেশি স্বৈরতন্ত্রের রমরমা। দুটি পরস্পর অবশ্যই যুক্ত, তবু গণতন্ত্রের সঙ্কট চললে স্বৈরতন্ত্রের রমরমা বোঝায় না। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী স্বৈরতন্ত্রী ---সেই কারণেই আমরা সংবিধানের সঙ্কট দেখছি— যার একটি শাখা— গণতন্ত্রের সঙ্কট নামে অভিহিত হতে পারে। লক্ষ্য করার বিষয় হলো--- পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়মকানুনের মধ্যে থাকতে রাজি নন। তিনি সব ব্যাপারেই পশ্চিমবঙ্গকে স্পেশ্যাল দেখাতে চান।

নোটবন্দি মানি না, জিএসটি মানি না, কেন্দ্রীয় আবাস যোজনা মানি না, মাওবাদী কমে যাওয়ায় কম অর্থ সাহায্য মানি না--- পশ্চিমবাংলার আলাদা লোগো, রাজ্যের নাম পরিবর্তন ইত্যাদি শতাধিক বিষয় উল্লেখ করা যায়। সেগুলি প্রমাণ করে, অন্তত অনুমান করতে সাহায্য করে যে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একটি আলাদা রাষ্ট্র চাইছেন— যার নাম হবে বাংলা। তিনি হবেন তার প্রধানমন্ত্রী এবং তার কোনো অতি নিকট আত্মীয় হবেন রাষ্ট্রপতি।

ঠিক এইরকমটাই চেয়েছিলেন সোহরাবর্দি। ভারত যখন বিভাজন হচ্ছে, বাংলাকে বিভাজন করার প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই এল। তিনি বললেন যে বাংলা ভাগ হবে না, বাংলা পাকিস্তানে যাবে না— হিন্দুস্তানেও যাবে না। তিনি এমন একটা ভাব করলেন যে বাংলা আর বাঙালির এতবড় শুভাকাঙ্ক্ষী কেউ নেই। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বজায় রেখে তিনি স্বাধীন বাংলা পরিচালনা করবেন। এখানকার বঙ্গবাসীরা হবেন বাংলার নাগরিক। এই সেই সোহরাবর্দি যিনি সরকারি উদ্যোগে ১৯৪৬ সালে 'দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' ও নোয়াখালিতে হিন্দু নিধন যজ্ঞ করেছিলেন। (দেশ ভাগের কথা হচ্ছিল ১৯৪৭-এ আর সোহরাবর্দি তার এক বছর আগেই ইতিহাস বিখ্যাত দাঙ্গা সরকারি উদ্যোগে ঘটিয়ে ছিলেন। তিনি ছিলেন তখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী।) তার বাসনা ছিল বাংলাকে হিন্দুস্তান বা পাকিস্তানের মধ্যে না ঢুকিয়ে পৃথক রাখা, পরে যাতে পুরো বাংলাদেশটাই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ১৯৪৬-এ যে দাঙ্গা তিনি ঘটিয়ে ছিলেন তার ভিত্তি ছিল মুসলমানদের জন্য ভারত বিভাগ করে পৃথক রাষ্ট্র করতে হবে— সেই রাষ্ট্রের নাম পাকিস্তান।

ড. শ্যামাপ্রসাদ ও আরও কিছু দেশপ্রেমী রাজনীতিকের উদ্যোগে বাংলা ভাগ হয়— পূর্ব ও পশ্চিমবাংলা গঠিত হয়। আর পাকিস্তান ভক্ত সোহরাবর্দি ভারত ভাগের পর যখন পাকিস্তানে বসবাস করতে গেলেন, তখন গভীর লাঞ্ছনার শিকার হয়ে তাকে আবার তার স্বদেশ হিন্দুস্থানেই ফিরে আসতে হয়েছিল।

বর্তমান পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী এমন বাংলা প্রেম দেখান যে আমরা যেন আমাদের ভারতের নাগরিক না বলে 'বাংলার নাগরিক' হিসাবে পরিচয় দিই। যাইহোক, ভারতের

সংবিধানের ১৪নং ধারা সম্পর্কে সম্ভবত তার গভীর আপত্তি। তাই নোটবন্দি, জিএসটি না মানার মতো এটাও তিনি মানেন না। পশ্চিমবঙ্গের কোনো ব্যাপারেই, কোনো জায়গাতেই সংবিধানের ১৪নং ধারা মানা হয় না। পুলিশের কাছে সকলে আবশ্যিক সাহায্য ও সুরাহা পায় না, এমনকী অভিযোগও জানাতে পারে না। গণতন্ত্রের সঙ্কট বললে কম বলা হয়। এটি স্বৈরাচারের নমুনা।

কিছুদিন আগে স্বস্তিকা পত্রিকাতেই আমি ব্যাখ্যা করেছিলাম কীভাবে গণতন্ত্রের মাধ্যমে স্বৈরাচারী হওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর স্বৈরাচার এই গণতন্ত্রের মাধ্যমেই পরিণতি পেয়েছে। আমরা শুধু উল্লেখ করি যে, এ রাজ্যে মানুষ নিজের ইচ্ছায় ভোট দিতে পারেন না, নিজের মনোমতো প্রার্থীকে ভোট দিতে পারেন না। সরকারি দল প্রলোভন ও ভয় দেখিয়ে ভোটারকে প্রভাবিত করে। শুধু তাই নয়, ভোট যারা পরিচালনা করেন অর্থাৎ প্রিজাইডিং অফিসার থেকে উপরদিকে নির্বাচন কমিশন পর্যন্ত সকলেই এই প্রলোভন ও ভয়ে বিহ্বল থাকে। ফলে এই তথাকথিত গণতন্ত্রেও ভোটাধিকার প্রয়োগ অতিশয় বিকৃত। ভোট পরিচালনাও বিকৃত। অনেকেই ভোট পরিচালনার ক্ষেত্রে, এরাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগের দাবি করেন। ভাবনাটা এই রকম যে কেন্দ্রীয়বাহিনী এলেই সকলে ঠিকমতো ভোট দিতে পারবে। কথাটা পুরোপুরি বেঠিক। প্রথমত, কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রধান হয়ে যিনি আসবেন, তিনি ভয় অথবা প্রলোভনের শিকার হয়ে যান। কয়েক বছর আগেই আমরা প্রমাণ পেয়েছি কেন্দ্রীয় বাহিনীর কর্তা হোটেলে আরাম করছিলেন, তাঁর বাহিনী নির্বিকার ছিল এবং স্বৈরাচারী গণতন্ত্রের যেমন তথাকথিত গণতান্ত্রিক ভোট হয়, সেরকম হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয়বাহিনী সরকারি দলের লোভ ও ভয় দেখানোর প্রক্রিয়া ষোলআনা বন্ধ করতে পারে না। তারা একদিন, দু'দিনের রক্ষক। নির্বাচনের ওই দুটি প্রক্রিয়া— লোভ এবং ভয় শুরু হয় অনেক আগেই যখন কেন্দ্রীয় বাহিনী মাতৃগর্ভে থাকে। কেন্দ্রীয়বাহিনী উপযুক্ত নেতৃত্বে থাকলে নির্বাচনের দিন ভোটাধিকার প্রয়োগ অনেকটা সহজ হয়— এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

তাই লড়াইটা ততখানি গণতান্ত্রিক সঙ্কটের বিরুদ্ধে নয়, যতটা সংবিধান সঙ্কটের বিরুদ্ধে হওয়া প্রয়োজন। ভারতীয় সংবিধানে স্বৈরাচারী হয়ে যাওয়ার সুযোগ নাই কিন্তু ভারতের গণতন্ত্রের স্বৈরাচারী হওয়ার সুযোগ আছে। পশ্চিমবঙ্গ এমন একটি রাজ্য যেখানে গণতন্ত্রেই শুধু ভ্রষ্টাচার নাই সংবিধান মেনে চলার ক্ষেত্রেও ভ্রষ্টাচার আছে।

এই রাজ্যের সরকার রাজ্যপালকে এমনকী রাষ্ট্রপতিকেও মানতে চান না। কেন্দ্রীয় সরকার সাংবিধানিক রীতিতে যে আইন তৈরি করবে তা মানতে চান না। সমস্ত মুখ্যমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীকে নিয়ে যে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেবেন তা মানতে চাইবেন না। এমনকী কেন্দ্রীয় সরকারের একান্ত গোপনীয় কার্যসূচি নিয়েও গণতন্ত্র দাবি করবেন। ভারতবর্ষে প্রচলিত এক হাজার টাকার নোট ও পাঁচশো টাকার নোট ২০১৬ সালের ৮ নভেম্বর থেকে বাতিল করা হবে— এই সিদ্ধান্ত কি সংসদে আলোচনা করে করার বিষয়? গোপনে এই কাজটির সিদ্ধান্ত না করলে, এই সিদ্ধান্তটি মূল্যহীন হয়ে যায়।

আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর দাবি যে এত গুরুতর সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো— কারোর সঙ্গে আলোচনা না করে— অতএব আমি তা মানব না— এটা গণতন্ত্র বিরোধী।

আবার জিএসটি-র সিদ্ধান্ত রাজ্যের অর্থমন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করে সর্বসম্মত ভাবে করা হলো— সেটিও আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মানতে চান না। (এখন পর্যন্ত জিএসটি-র সুবিধা সব থেকে বেশি পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। আর পশ্চিমবঙ্গই জিএসটি প্রধান বিরোধী বক্তা।)

এগুলির কোনোটিই গণতন্ত্রের সঙ্কট বোঝায় না। বোঝায় স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবের কথা। পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী এই রাজ্যের নাম বদল করে বাংলা নামে একটি রাষ্ট্র গঠন করতে চান। এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মহোৎসব চাই। সেই মহোৎসবে—

না রবে বিদুর ভীষ্ম, না রবে সঞ্জয়,
নাহি রবে লোক নিন্দা, লোকলজ্জাভয়
কুরুবংশ রাজলক্ষ্মী নাহি রবে আর
শুধু রবে অন্ধ পিতা, অন্ধপুত্র তার।
আর কালান্তক যম—

এই রাজ্যের মহিলা দুর্যোধনটি কেবল ক্ষমতাই চান। এ এক প্রচণ্ড স্বৈরাচারী মানসিকতা— যাকে 'গণতন্ত্রের সঙ্কট' ভেবে খাটো করে দেখা ঠিক নয়।

যে-কোনো স্বৈরাচারী শক্তির বিরুদ্ধে তীব্র যুদ্ধ করতে হয়। বিপরীত পক্ষকে ধর্মে ও শক্তিতে উপযুক্ত হয়ে উঠতে হয়। দুঃখের বিষয় হলো, এই স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো যোগ্যতা বা উপযুক্ততা গণতন্ত্রপ্রেমীরা সংগ্রহ করে উঠতে পারেননি, তার প্রস্তুতিও দেখা যাচ্ছে না। সরকার বিরোধী শক্তি যুদ্ধং দেহি মানসিকতা নিয়ে সৈন্যসংগ্রহ, যুদ্ধবিদ্যার প্রশিক্ষণ এবং উপযুক্ত সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ না করলে স্বৈরতন্ত্র ধ্বংস করা যায় না।

সরকার স্বৈরতন্ত্রী হয়েছে বলে একদিকে যেমন সংবিধানের আশ্রয় নিতে হবে, অপরদিকে দীর্ঘমেয়াদি সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে হবে। রাজনীতিকে যদি ধান্দাবাজি ধরে নেওয়া হয় তাহলে স্বৈরতন্ত্রের বাড়বাড়ন্ত রোধ করা যাবে না। স্বৈরতন্ত্র নিজেই ধান্দাবাজ, ক্ষমতা ও অর্থলোভী, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ হবে ধর্মভিত্তিক, দেশ ও দেশবাসীর প্রতি আত্মনিবেদনের ভিত্তিতে— কোনো ধান্দাবাজির মানসিকতায় নয়।

পশ্চিমবঙ্গে সাংবিধানিক সঙ্কট বা গণতন্ত্রের সঙ্কট যে সঙ্কটই হোক লড়াইটা পশ্চিমবঙ্গবাসীকেই লড়তে হবে। অন্যান্য শক্তি সাহায্যকারী হতে পারে মাত্র। মূল শক্তি পশ্চিমবঙ্গবাসীই। ■

এবারের সাধারণতন্ত্রে ভারতের অতিথিরা

ভারত সরকারের পুবে তাকাও নীতির সফল রূপায়ণ এবার দেখা যাবে আমাদের ৬৯তম সাধারণতন্ত্র দিবসে। সব কিছু ঠিকঠাক চললে ভারতবর্ষের দশ প্রতিবেশী বৈদেশিক রাষ্ট্রের প্রধান ওইদিন সশরীরে উপস্থিত থাকবেন লালকেল্লায় সেনাবাহিনীর প্যারেডে। রাষ্ট্রগুলির মধ্যে রয়েছে ব্রুনেই, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, মালয়েশিয়া, মায়ানমার, ফিলিপাইনস, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম। এদের রাষ্ট্রপ্রধানদের পরিচয় নীচে দেওয়া হলো :

ব্রুনেই :

ব্রুনেইয়ের রাষ্ট্রপ্রধান হাসানাল বোলকিয়া মুইজাদ্দিন ওয়াদুল্লাহ একাধারে

সেদেশের ২৯তম সুলতান ও প্রথম প্রধানমন্ত্রী, যাকে সেখানকার ভাষায় ইয়াঙ-দ্য-পারতুয়ান বলে ডাকা হয়। ৭১ বছর বয়সী এই সুলতানের জন্ম ১৯৪৬ সালের ১৫ জুলাই। কুয়ালালামপুরে পড়াশুনো। স্নাতক অবধি পড়েছেন। তাঁর তিন পত্নী ও বারোটি সন্তান।

কম্বোডিয়া :

কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হুন সেন। তিনি কম্বোডিয়ান পিপলস পার্টির সভাপতি ও কান্ডাল থেকে সংসদে নির্বাচিত। তাঁর জন্ম ১৯৫২ সালে ৫ আগস্ট। ১৯৭৫ সালে বান রেনির সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ

হন তিনি। সাত পুত্র-কন্যার জনক এই কম্বোডিয়ান প্রধানমন্ত্রী।

ইন্দোনেশিয়া :

ইন্দোনেশিয়ার সপ্তম ও বর্তমান প্রেসিডেন্ট জোকো উইডোডো। ২০১৪ সালে রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার আগে তিনি সুরাকারটার মেয়র (২০০৫-২০১২) এবং জাকারতার গভর্নর (২০১২-২০১৪) হিসাবে কাজ করেছেন।

তাঁর জন্ম ১৯৬১ সালের ২১ জুন। পত্নীর নাম ইরিয়ানা, তিনি তিন সন্তানের জনক।

লাওস :

লাওসের বর্তমান রাষ্ট্রপতি বাউনহাং ভোরাচিঠ। ২০১৬ সালে তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার আগে দেশের প্রধানমন্ত্রী

(২০০১- ২০০৬) ও উপরাষ্ট্রপতি (২০০৬-২০১৬)-র দায়িত্ব সামলেছেন। তাঁর জন্ম ১৯৩৮ সালের ১৫ আগস্ট। ৮০ বছর বয়সেও লাওসের পিপল'স রেভোলিউশনারি পার্টির সাধারণ সম্পাদকের কাজ করছেন। তাঁর স্ত্রী খামেং ভোরাচিঠ।

মালেয়েশিয়া :

মালয়েশিয়ার ষষ্ঠ ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দাতো শ্রী হাজি মহম্মদ নাজিব বিন তুন হাজি আব্দুল রজাক। উচ্চশিক্ষা বিদেশে নটিংহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৫৩ সালের ২৩ জুলাই তাঁর জন্ম। দুই স্ত্রী, পাঁচ পুত্র-কন্যা। ২০০৯ সাল থেকে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব তিনি সামলাচ্ছেন।

মায়ানমার :

মায়ানমারের রাষ্ট্রপতি তিন কিও। জন্ম ১৯৪৬ সালের ২০ জুলাই। ইয়াঙ্গন ইনস্টিটিউট অব ইকনমিক্সের কৃতী ছাত্র। সেদেশের ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্র্যাসি দলের সদস্য। স্ত্রীর নাম সু সু লুই। ১৯৬২ সালের পর থেকে সেনাবাহিনীর সঙ্গে সমঝোতায়

রাষ্ট্রপতি হবার যে নজির এতকাল ছিল, তা ভেঙে তিনিই মায়ানমারের প্রথম নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি।

ফিলিপাইনস :

ফিলিপাইনসের ষোড়শ ও বর্তমান রাষ্ট্রপতি বড়রিগো রডি রোয়া ডুতারতে। পেশায় আইনজীবী এই ফিলিপাইনীয়

রাষ্ট্রপতির জন্ম ১৯৪৫ সালের ২৮ মার্চ। তাঁর রাজনৈতিক দল পিডিপি-লাবান। এর আগে তিনি দাভাও শহরের মেয়র (২০১৩-২০১৬) ছিলেন। তাঁর দু'জন পত্নী।

সিঙ্গাপুর :

সিঙ্গাপুরের বর্তমান রাষ্ট্রপতি হালিমা বিন্তি জ্যাকব। তিনি সেদেশের শাসকদল পিপল'স অ্যাকশন পার্টির নবম 'স্পিকার'

(২০১৩-২০১৭) হিসাবে সেদেশের সংসদের দায়িত্ব পালন করেছেন। জন্ম

১৯৫৪ সালের ২৩ আগস্ট। গত বছর ১৪ সেপ্টেম্বর নির্দল রাজনীতিক হিসাবে তিনি রাষ্ট্রপতি পদে অভিষিক্ত হন। ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুরের এই কৃতী ছাত্রী একাধিক সম্মানে ভূষিতা। স্বামী মহম্মদ আব্দুল্লা আলহাবশি। তাঁর পাঁচ সন্তান।

থাইল্যান্ড :

বর্তমানে থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী প্রায়ুত চান-ও-চা। তিনি সেদেশের শাসকগোষ্ঠী জুন্টার সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত অফিসার। তিনি জুন্টা সেনাক্ষ্ম বাহিনীর ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর পিস অ্যান্ড অর্ডারের প্রধান ছিলেন। ১৯৫৪ সালের ২১ মার্চ তাঁর জন্ম। ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ অব থাইল্যান্ডের মেধাবি ছাত্র। স্ত্রী-র নাম নারাপর্ন চান ও-চা। দুই সন্তানের পিতা।

ভিয়েতনাম :

সোশ্যাল রিপাবলিক অব ভিয়েতনামের বর্তমান রাষ্ট্রপতি ট্রান ডাই কোয়াঙ। ১৯৫৬ সালের ১২ অক্টোবর তাঁর জন্ম। কলাবিদ্যায় স্নাতক, আইনশাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রি রয়েছে তাঁর। স্ত্রী মাদাম নুই থি হি। জাতীয় নিরাপত্তার ওপর একাধিক গ্রন্থ রয়েছে তাঁর। ■

পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু এবং হিন্দুত্বের সঙ্কট

অভিমন্যু বসু

অবিভক্ত বাংলাতে হিন্দুরা স্বাধীনতার আগে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' দেখেছে। এরপরে আমরা দেখেছি স্বাধীনতার পর পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে আসা শরণার্থীদের। দেখেছি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় খান সেনার অত্যাচারে ঘরবাড়ি ছেড়ে আসা লক্ষ লক্ষ বিপন্ন হিন্দুকে। ছিন্নমূল মানুষের স্রোতে সেদিন কলকাতা ভেসে গিয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গ প্লাবিত হয়েছিল। হাড়ভাঙা পরিশ্রম আর নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় সেইসব সর্বহারা মানুষ এই রাজ্যে ক্রমশ নিজেরা সম্মানের সঙ্গে বসবাস শুরু করে। বস্তির ঘরে বা দুই কামরার ছোট্ট ফ্ল্যাটে একটা ঠাকুরের আসন তৈরি করেছিলেন তাঁরা। ছোটরা শ্রী পঞ্চমীতে স্কুলে সরস্বতী পুজোয় অঞ্জলি দিতে পারত, দশমীর দিন দুর্গাপ্রতিমার বিসর্জনটুকু দিতে পারত বড়োরা।

২০১১ সালে হলো ইতিহাসের স্খলন। বামফ্রন্টের ওপর রাগে, ক্রোধে এবং সঠিক বিকল্পের অভাবে এই বঙ্গের মানুষ একটা গেস্টাপো এবং লুম্পেন বাহিনীকে ক্ষমতায় নিয়ে এল। নিয়ে এলপ চিটফান্ডের টাকায়, বাজারি মিডিয়ার নিরন্তর প্রচার এবং এক আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে। জিতে আসার পর, প্রাক্তন সরকারের সুযোগ্য ছাত্রী বুঝে গেলেন মেশিনারি ঠিক রাখার জন্য চাই টাকা এবং খুনে বাহিনী। টাকার থলে হাতে এগিয়ে এল গৌরী সেন। মাস্কেট হাতে নিয়ে এল লুঙ্গি ও জালি গেঞ্জি পরা এক ভৈরব বাহিনী। এরা দাপিয়ে বেরালো কোচবিহার থেকে কামদুনি, কালিয়াচক থেকে কাকদ্বীপ।

২০১১ সাল থেকে এই পশ্চিমবঙ্গে শুরু হলো হিন্দুত্ব বিরোধী এক রিয়্যালিটি শো। তৃণদাস সরকারি কবি এবং প্রাক্তন আইনজীবী এবং মেয়র কলকাতার রাজপথে গোমাংস ভক্ষণ করলেন। লাল নীল সব সরকারের পক্ষেই থাকা সুবোধ কবি গোমাংস ভক্ষণের পুরস্কার পেলেন হাতেনাতে। তিনি কবিতা অ্যাকাদেমির চেয়ারম্যান হয়ে গেলেন। খুব সূক্ষ্ম ভাবে বাংলা ইন্টেলিজেন্সিয়ার কাছে একটা বার্তা দেওয়া গেল যে হিন্দু ভাবাবেগে আঘাত হানতে পারলেই সরকার তোমার সঙ্গে আছে। সাহিত্যিক, কবি, খেলোয়াড়, আমলা মোটমাট সমাজের সর্বস্তরে এই বার্তা রটে গেল ক্রমে যে শুধু 'সেকুলার' হলেই চলবে না, হতে হবে হিন্দুবিরোধী। মিডিয়াকে বলে দেওয়া হলো হিন্দু নিপীড়নের খবর স্রেফ চেপে যেতে। ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্টেড সব মিডিয়াকেই হয় বিজ্ঞাপনের লোভ নয় হুমকি। কলকাতার এক বিধায়ক, যিনি হাতকাটা গেঞ্জি পরে নারদার টাকা নিলেন ম্যাথু স্যামুয়েলের থেকে তিনি তো সগর্বে বলেই দিলেন, কলকাতার বন্দর এলাকাকে তিনি 'মিনি পাকিস্তান' বানিয়ে দিয়েছেন। সেই তাঁকেই করা হলো মন্দির কমিটির চেয়ারম্যান। শিশুদের সিলেবাস থেকে মা, বাবার বদলে শেখানো শুরু হলো 'আম্মি', 'আব্বা'। এ এক সর্বগ্রাসী তোষণ। তাজা নেতা, মাথায় অক্সিজেন কম থাকা নেতা প্রকাশ্যে পুলিশ এবং প্রশাসনকে বোমা মারতে বলছেন এবং মারছেনও। আর পুলিশ ফাইল মাথায় নিয়ে থানার টেবিলে নীচে লুকোচ্ছে, নগরকোটাল লুকিয়ে রাখছেন নীল ডায়েরি, লাল পেনড্রাইভ, ডিজি হাতজোড় করে মেঘবালিকার পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন... এও আমাদের চেনা দৃশ্য। অথচ রামনবমীর শোভাযাত্রায় সরকার ঘাবড়ে গিয়ে দাঁত নখ বের করে থানায় থানায় নির্দেশ পাঠালো কেস দায়ের করার জন্য। কই, মহরমের মিছিলে খোলা তলোয়ার হাতে কম আস্ফালন তো হয় না এই বাংলায়!

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাংলা আজ ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে। সঙ্কটাপন্ন বাংলার গণতন্ত্র। আর একদশক পরে সন্ধ্যেবেলা শঙ্খ বাজবে তো আমার ঘরে, ধূপ ধুনোর গন্ধ পাব তো পুজোর মণ্ডপে, পশ্চিমবাংলার সরকারি দপ্তরে ঢোকার আগে সধবার গলা থেকে মঙ্গলসূত্র খুলে নেওয়া হবে না তো? প্রশ্নগুলো সহজ, উত্তরও তো জানা।

পরম্পরা

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত

আরনল্ড জোসেফ্ টয়েনবি : (১৮৮৯-১৯৭৫)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন ব্রিটেনের অন্যতম অর্থনৈতিক ইতিহাসকার এবং সাহিত্যিক। তাঁর সমগ্র গবেষণামূলক সাহিত্য কর্ম ১২ খণ্ডে সমাপ্ত হয় ১৯৩৪ থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম— এ স্টাডি অব হিস্ট্রি।

উদ্ধৃতি : মানব ইতিহাসের এই ভয়ানক সংকটময় মুহূর্তে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় প্রাচীন হিন্দু ধর্মপথ। আমাদের আনতে হবে সেই মনোভাব এবং কর্মপ্রেরণা যাতে করে আমরা সমগ্র মানব জাতি একই পরিবারের সদস্য হিসাবে বিকশিত হতে পারি।

উৎস : রেলিভান্স অব এনভায়রনমেন্ট : এ ক্রিটিক অন্ ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন থিয়োরি, লেখক : নরোত্তম জ্ঞান।

উদ্ধৃতি : সুতরাং আমাদের এখন ভারতের দিকে ফিরে তাকাতে হবে। তার দেওয়া আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা উপহার, যা মানুষকে পরিপূর্ণ মানবে পরিণত করে, সেটা আজও ভারতবাসীর মধ্যে বিদ্যমান। সারা পৃথিবীকে ভারতের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এটা ছাড়া আর অন্য কোনো উপায় নেই যাতে করে আজ মানব জাতিকে আত্ম-বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করা যেতে পারে।

উৎস : মডার্ন এসেস : স্টাডিং ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্র লিটারেচার, লেখক : আর. সি. প্রসাদ।

জর্জ বার্নার্ড শ : (১৮৫৬-১৯৫০)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন বিখ্যাত আইরিশ

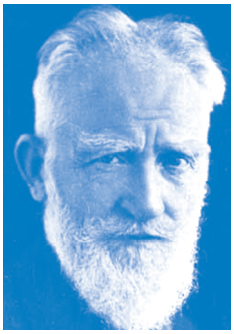

নাট্যকার এবং সাম্যবাদের মুখপাত্র। তিনি ছিলেন বিংশ শতাব্দীতে নাট্য জগতের প্রতিভূ বিশেষ। তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। তিনিই 'লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স' প্রতিষ্ঠা করেন।

উদ্ধৃতি : ভারতীয় জীবন পদ্ধতি দেখায় মানব জীবন ধারণের বাস্তবিক এবং স্বাভাবিক উপায়। আমরা পাশ্চাত্য দেশবাসীরা, নিজেদেরকে এক নকল মুখোশের অন্তরালে ঢেকে রেখেছি। ভারতবাসীর মুখে দেখা যায় দেবদত্ত কোমল এক অভিব্যক্তি।

উৎস : হিন্দুইজম : পাথ্ অব দ্য অ্যানসেন্ট উইসডম, লেখক : হিরো.জি.বাড্লানি।

উদ্ধৃতি : হিন্দুদের অসংখ্য দেবদেবী দেখে প্রথম দৃষ্টিতে হতবুদ্ধি হতে হয় কিন্তু একটু বিচার করলেই বোঝা যাবে তারা সবাই একই পরমেশ্বরের বিভিন্ন বহিঃপ্রকাশ মাত্র। সর্বদা সেই একই পরমপুরুষ আছেন যিনি নরত্ব আরোপকে অস্বীকার করেন। এর জন্যই সারা পৃথিবীতে হিন্দুধর্ম সব থেকে সহিষ্ণু ধর্মমত। কারণ এই ধর্মমতে যে তুরীয় পরমেশ্বরের ধারণা করা হয়েছে তিনি সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ। বাস্তবিক ভাবে হিন্দুধর্ম অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক ও সমন্বয় বিধানকারী অতি সূক্ষ্ম আবার সুগভীরও, একাধারে পৌত্তলিক আবার নিরাকারীও বটে— সকলেরই বিচরণক্ষেত্র সেই একই ধর্মমত।

উৎস : হিন্দুইজম, রিলিজিয়ন অ্যান্ড ওয়ে অব্ লাইফ, লেখক : সত্যব্রত রামদাস প্যাটেল।

জুলে মিশ্লে : (১৭৯৮-১৮৭৪)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন ফ্রান্সের অন্যতম ইতিহাসকার। তাঁর লেখা বিখ্যাত

পুস্তকটির নাম হলো, 'হিস্ট্রি দ্য ফ্রান্স'।

উদ্ধৃতি : পাশ্চাত্যের সবকিছুই সংকীর্ণ। গ্রিস এত ক্ষুদ্র যে আমার দমবন্ধ হয়ে আসে। মরুভূমির দেশ জুডিয়াতে আমার হাঁফ ধরে যায়। আর যখন আমি বিশাল এশিয়ার দিকে তাকাই বিশেষ করে প্রাচ্যের ভারতভূমির দিকে, যেখানে আছে অসামান্য কাব্যগ্রন্থ রামায়ণ— যা ভারত মহাসাগরের মতোই বিশাল আর গভীর, সোনালী সূর্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল। যাতে দেখা যায় অসংগতিহীন দৈনিক ঐকতান, এক অনাবিল শান্তি বিরাজমান, দ্বন্দ্বের মধ্যেও আছে অসীম মাধুর্য, সীমাহীন সৌভ্রাতৃত্ববোধ, যা সমগ্র জীবজগতের মধ্যেই পরিব্যাপ্ত, অতল সীমাহীন মহাসাগরের মতোই দয়া, করুণা আর ক্ষমা ধর্মযুক্ত।

উৎস : দ্য ফ্রাগ্রাস অব ইন্ডিয়া : ল্যান্ডমার্ক অব দ্য ওয়ার্ল্ড অব টুমোরো, লেখক : লুই রেভেল।

—সংকলক : সুনীল গেঁউলি

BANSIDHAR BADRIDAS MODI PRIVATE LTD

EDEN HOUSE

17/1, LANSDOWNE TERRACE

LANSDOWNE MANOHAR PUKUR CROSSING

KOLKATA - 700026

OWNERS : SREE SIBBARI T.E

HEAD-OFFICE

P.O - DIBRUGARH, ASSAM

With best Compliments from :

তোমরা যদি ধর্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্য জাতির জড়বাদ-সর্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিনপুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ (৫।৪৬)

BHARAT STEEL INDUSTRIES

190, Girish Ghosh Road, Belurmoth, Howrah

Pin- 711 202

মহিলাদের প্রতি আবার বড় অবিচার করা হলো

অতিথি কলম

আরিফ মহম্মদ খান

মেয়েদের প্রতি আবার বড় অবিচার করা হলো তিন তালাক বিলের অন্ধ বিরোধিতা করে। মুসলিম আইন রক্ষাকর্তা অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড প্রমাণ করল তারা এখনও ১৯৮৬ সালের শাহাবানু মামলার সময়সীমাতেই আটকে রয়েছে।

২০১৭ সালের ২ আগস্ট সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতিরা তাঁদের রায়ে তাৎক্ষণিক তিন তালাককে সংবিধানের ১৪নং ধারায় প্রদত্ত মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনকারী আখ্যা দিয়েছেন। এই রায়ের মাধ্যমে ইতিপূর্বে ২০০২ সালে শামিম আরার বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত মামলায় দেওয়া রায়কেই আবার সমর্থন করেছেন। শামিম আরার মামলায় আদালত ঠিক কোরানের আদেশ অনুসারী হয়ে দু'টি বিন্দুকে ভিত্তি করে রায় ঘোষণা করেছিল— (১) তালাক দেওয়ার পেছনে যথাযোগ্য কারণ থাকতে হবে এবং (২) কম করে দু'জন মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে মতভেদ মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করতে হবে। যদি এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় তখন সেক্ষেত্রেই কেবল তালাক কার্যকরী করা যাবে। তাহলে দেখা গেল এক লপ্তে তিন তালাক ২০০২ সালেই কোরান বিরোধী বলে বেআইনি ছিল আর সাম্প্রতিক ২০১৭ সালের রায় অনুযায়ী এটি সংবিধানের মৌলিক অধিকার বিরোধী।

২০০২ সালের বেআইনি ঘোষণা হওয়ার পর কতজন মহিলাকে তিন তালাক দেওয়া হয়েছে তার সংখ্যাটা আমরা না জানলেও ২০১৭ সালের আগস্টের পর এই চার মাসে বেআইনি তিন তালাকের সংখ্যা একশো ছাড়িয়ে গেছে সেটা জানতে পেরেছি। এই দু'টি ঘটনা থেকে এটা সহজেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়— যে লোকগুলি তিন তালাক প্রথাকে বহাল রাখতে সোচ্চার হচ্ছে তারা একদিকে মৌলিক অধিকার রক্ষার তোয়াক্কা যেমন করে না, তেমনি তাদের নিজ ধর্মের পবিত্র গ্রন্থে যে অনুশাসন লিপিবদ্ধ আছে তাকেও কোনও সম্মান দেয় না। এই অপরাধীদের কথা ছেড়ে দিলেও মুসলমান ধর্মের অন্যান্য যে হোমরা-চোমরা মোল্লারা আছেন যাদের বড় অংশই অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড'-এর সদস্য, তাঁরা ফতোয়া দিচ্ছেন সুপ্রিম কোর্ট যাই বলুক না কেন ইসলামে তিন তালাকের অনুমোদন আছে।

এখন কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, তবে কি কেন্দ্রীয় সরকার আইনের এমন সরাসরি অবমাননা দেখেও নীরব দর্শক হয়ে থাকবে? তাই যদি হয় তবে সেটা হবে সরকারের নৈতিক ও সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে চরম অবহেলা। দেশের প্রশাসনিক কর্তাদের অন্যতম প্রধান কাজই হচ্ছে সরকার প্রণীত আইনগুলি বা ন্যায়ালয়ের প্রদত্ত নির্দেশগুলির সঠিক ও যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

সম্প্রতি লোকসভায় যেভাবে প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে মুসলিম উইম্যান (Protection of Rights on Marriage) বিলটি পাশ হয় তা দেখে আমার মনে আশা জেগেছিল যে দেরিতে হলেও আমাদের রাজনীতিবিদরা অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েছেন, বিশেষ করে যেগুলি জঘন্য ধরনের ভুল। আমি প্রবল আনন্দে বুক বেঁধেছিলাম যে এবার অন্তত রাজনৈতিক কারণ নরনারীর সমমর্যাদা ও সম্মানের ক্ষেত্রে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। কিন্তু মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই দেখলাম ওই অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড (আই এম পি এল বি)-এর পেশীশক্তি অর্থাৎ রাজনৈতিক সমর্থনের সূত্রে বিলটির চটজলদি পাশ করানো আটকাতে পর্যাপ্ত বিরোধী সমর্থন আদায় করে ফেলল যাতে এটি এখনই আইনে পরিণত না হয়। তাদের বাধাদানের ক্ষেত্রে প্রধান যুক্তি ছিল বিয়ে-শাদির বিষয়টা সম্পূর্ণ দেওয়ানি ব্যাপার। এর মধ্যে ফৌজদারি আইন ঢোকানো উচিত নয়। তিন তালাকের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদের থেকে বড় মিথ্যে আর কী হতে পারে! মুসলমান আইনের দিকে একটু চোখ বোলালেই কিন্তু বোঝা যাবে যে বরাবর তাৎক্ষণিক তিন তালাককে অপরাধমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতেই দেখা হয়েছে। প্রসঙ্গত, খলিফা উমরের সময় এই তিন তালাক দিয়ে বিচ্ছেদ প্রথা প্রথম আইনি মান্যতা পাওয়ার চেষ্টা করে তখনই যে ব্যক্তি অফেরতযোগ্য বা তিন তালাক দেবে তাকে চারশোবার চাবুক মারার নিদান দেওয়া হয়। দ্বিতীয় বিরোধিতাটি করা হয়েছে এই বলে যে যদি তিন তালাক দিয়ে স্বামী জেলে যায় সেক্ষেত্রে বউ-বাচ্চার ভরণপোষণ করবে কে? অবাক হয়ে দেখছি এই যুক্তিগুলি যে ব্যক্তিরা পেশ করছেন তাদের

বেশিরভাগই সেই ১৯৮৬ সালে শাহাবানু মামলায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে খেপে যাওয়া মোল্লাদের তুষ্ট করতে আদালতের রায়কে বাতিল করে নতুন আইন পাশ করানোর ক্ষেত্রে সবিশেষ সক্রিয় ছিলেন।

সেই সময় পার্সোনাল ল বোর্ড নিদান দিয়েছিল যে তালাক দেওয়ার তিন মাস অর্থাৎ বিচ্ছেদপ্রাপ্ত স্ত্রীদের প্রতি কোনও দায় নেই। কিন্তু ভারতের সিআরপিসি (ক্রিমিনাল প্রসিডিওর)-এর ১২৫নং ধারা অনুযায়ী স্বামীর দায় বরাবর বহাল থাকবে অর্থাৎ স্বামীকে খরপোশ দিতেই হবে বিশেষ করে যদি বিবাহ বিচ্ছিন্না স্ত্রীর জীবন ধারণ করার নিজস্ব কোনও সঙ্গতি না থাকে। অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড স্পর্ধা দেখিয়ে বলেছিল অপরাধ আইনের এই ধারায় সরকার পরিবর্তন আনুক, অন্যথায় মুসলমানদের এর আওতা থেকে বাদ দেওয়া হোক।

তদানীন্তন সরকার শাহাবানু মামলায় তাদের এই দাবি নির্দ্বিধায় মাথা নত করে মেনে নিয়েছিল এবং মহামান্য আদালতের রায় বাতিল করে এক নতুন আইন পাশ করেছিল। ভুললে চলবে না এই আইন বলবৎ হওয়ার কয়েক বছর পর থেকেই সুপ্রিম কোর্ট এই ধরনের মহিলাদের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহমর্মিতা প্রদর্শন করার চেষ্টা করতে থাকে। নিম্ন আদালতে ১২৫নং ধারা থেকে ছুটি পেতে বহু মুসলমান আবেদন করলেও তাদের আবেদন সাধারণত গ্রাহ্য হত না।

তাহলে, তালাকপ্রাপ্তাকে খোরপোশ কে দেবে— এ প্রশ্ন ফিরে আবার অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের কর্তাদেরই করতে হবে। কারণ তারা এখনও ১৯৮৬ সালের অবস্থানেই স্থিত আছে অর্থাৎ কোনও স্বামী এক পয়সাও বিবাহ-বিচ্ছিন্নাকে দেবে না। মাত্র গত বছরেই তারা প্রেস বিবৃতি দিয়ে আদালতের বিভিন্ন রায়ের বিষয়ে তাদের অসন্তোষ ব্যক্ত করে বলেছে তারা শাহাবানু মামলার রায়ের ক্ষেত্রে আইন পালটে যে সুবিধে (অন্যান্য) আদায় করেছিল তাকে প্রায়ই অন্তর্ঘাত করা হচ্ছে। ১৯৮৬-র আইনের ভিন্ন ব্যাখ্যা ও ইন্টারপ্রিটেশনের ফলে তাদের অসুবিধেয় ফেলা হচ্ছে। অথচ, গত বছর মে মাসে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের মৌখিক ও লিখিত হলফনামা দিয়ে সর্বোচ্চ আদালতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তিন তালাক একটি হঠাৎ উদ্ভাবিত বিষয় এবং তারা এর বিরুদ্ধে প্রচার চালাবে। কেননা তারা এটিকে পাপ ও মহিলাদের ওপর ঘোর অবিচার বলে মনে করে।

হায়! তারাই এখন নিজেদেরই মত অনুযায়ী যারা এই 'তিন তালাককে' উদ্ভাবন করে 'মহা পাপ' করছেন ও মহিলাদের ওপর চরম দুর্দশা নামিয়ে আনছেন, তাদেরই বাঁচাতে রাজ্যসভায় পেশ করা বিলটি আটকাতে যে-কোনও ভাবে বিরোধী সমর্থন জোটাবার মরিয়া চেষ্টা করছেন। যাতে তথাকথিত পাপীদের রক্ষা করা যায়। তাদের কোনও দায়বদ্ধতা না থাকে। এই কুৎসিত প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ অবশ্যই অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের প্রাপ্য কেননা তারা সেই রাজনৈতিক দাদাদের সাহায্যেই অন্তত সাময়িকভাবে হলেও বিলটির আইনে পরিণত হওয়া আটকাতে পেরেছে, ঠিক যেমন তারা ১৯৮৬ সালে মহামান্য আদালতের রায় বাতিল করে নতুন কায়েমি স্বার্থ রক্ষাকারী আইন এনেছিল।

(লেখক প্রাক্তন কংগ্রেসি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,

মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

শুধু রাজস্থান নয়, এরকম ঘটনামাত্রই নিন্দনীয়

সম্প্রতি লভ জেহাদের অভিযোগে রাজস্থানে পশ্চিমবঙ্গের এক মুসলমান শ্রমিককে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর পর জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হলো। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী মৃত আফরাজুলের পরিবারের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি মৃতের পরিবারকে ৩ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া, পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়া এবং মৃতের তিন মেয়ের পড়াশোনা-সহ যাবতীয় সাহায্য দেওয়ার বিষয়ে সরকার পাশে থাকবে বলে ঘোষণা করেছেন। অতি উত্তম ঘোষণা। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণাকে আন্তরিক স্বাগত জানাই।

শুধু রাজস্থানে নয়, ভারতের বিভিন্ন রাজ্য-সহ বাংলাতেও এরূপ নৃশংস ঘটনা ইতিপূর্বে ঘটেছে। আমার সংগৃহীত তথ্য থেকে বিভিন্ন প্রদেশের কতকগুলি নির্মম ঘটনার কথা জানানোর চেষ্টা করছি। সেগুলি হলো—

১। ২০০৮ সাল, মুর্শিদাবাদ। লক্ষ্মণপুর। বিহারি মজদুর শৈলেন্দ্র প্রসাদকে সালিশি সভায় বিচার করে মাথা কেটে হত্যা করা হয়। কারণ— মুনিরা বিবি নামক এক মুসলমান নারীকে বিবাহ। খুনি— মুনিরা বিবির বাবা ও পাড়া প্রতিবেশী।

২। নভেম্বর ২০, ২০০৯ সাল। বাঙ্গালোর, তিলকনগর। তামিলনাড়ুর যুবক মাদিয়ানকে হত্যা করা হয়। কারণ হাজেরা নামে এক মুসলমান তরুণীর সঙ্গে প্রেম। খুনি— মোহম্মদ আকবর, কাজি মইনুদ্দিন, জাহির খান, শায়েদ নিয়ামত-সহ আরও কয়েকজন।

৩। নভেম্বর ২৫, ২০১০ সাল। রেহেনা পারভিনকে তার পিতা হত্যা করে। কারণ হিন্দু যুবকের সঙ্গে প্রেম।

৪। অক্টোবর, ২০১২। মুসলমান মেয়ের সঙ্গে প্রেমের অপরাধে কেরলের প্রতিভাবান হিন্দু ফুটবলার জিঠু মোহনকে গায়ে পেট্রল ঢেলে জ্বালিয়ে খুন।

৫। নভেম্বর ২০১৪। হাপুরের তপশিলি যুবক সোনুকে প্রকাশ্য দিবালোকে খুন করা হয়। অপরাধ দানিস্তা বেগম নামে এক মুসলমান মহিলাকে বিবাহ। খুনি দানিস্তা বেগমের ভাই।

৬। মার্চ ২০১৫। বিহার, হাজিপুরের যুবক সঞ্জীবকে অপহরণ করে হত্যা করা হয়। সঞ্জীবের অপরাধ মুসলমান মহিলাকে বিবাহ। খুনি মুসলমান মহিলার শ্বশুরবাড়ির লোক।

৭। মে, ২০১৫। উত্তরপ্রদেশে দুই মহিলা জাহিদা ও হুশনাকে তাদের পরিবার গলায় দড়ি দিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে। অপরাধ হিন্দু ছেলেকে বিবাহ।

৮। সেপ্টেম্বর ২০১৭। তিরুপতির যুবক উপেন্দ্রর বাড়িতে চড়াও হয়ে তাকে কোপানো হয়। কারণ মুসলমান মহিলার সঙ্গে প্রেম। খুনি আহমত উল্লাহ, হামানুল্লাহ, রহমতউল্লাহ।

চিঠিপত্র

৯। ডিসেম্বর ১, ২০১৭। বিহারে মুকেশ কুমার ও নূরজাহান খাতুন নামের কিশোর-কিশোরীকে হত্যা করা হয়। কারণ অন্য ধর্মে প্রেম। খুনি নূরজাহান খাতুনের পরিবার। এরকম অনেক ঘটনা আছে যা স্থানাভাবে লেখা গেল না। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, ২০০৮ সালে মুর্শিদাবাদের ঘটনা ঘটে ছিল বামফ্রন্টের আমলে। যাঁরা সেই সরকারের বিরোধী ছিলেন তাঁরা শাসকদলের মতোই সুখে কুলুপ এঁটে ছিলেন। অথচ ঘটনাটি ঘটানো হয়েছিল সালিশি সভায় রীতিমতো বিচার করে মাথা কেটে। আজকে আমরা মন্ত্রী, নেতা, সাধারণ মানুষ সবাই মিলে ক্যামেরাম্যানকে সঙ্গে নিয়ে আফরাজুলের বাড়িতে গিয়েছি এবং আবার যাব। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে যে ২০০৮ সালে কেউ শৈলেন্দ্র প্রসাদের বাড়ি যাওয়ার সময় পায়নি দূর থেকে তাঁর পরিবারকে মৌখিক কোনও আশ্বাসবাণীও বিতরণ করার ইচ্ছা জাগেনি। মুর্শিদাবাদ ও অন্য প্রদেশের ঘটনাগুলোর জন্য সেই সমস্ত রাজ্যের বা গোটা দেশের বা আমাদের মতো বাঙালির মন ব্যথায় কাতরও হয়নি। তাই শুধু রাজস্থানের ঘটনা নয়, সকল ক্ষেত্রের ঘটনার জন্যই ধর্মনিরপেক্ষতার ভান ছেড়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কঠোর নিন্দা করার হিম্মত দেখাতে হবে।

—**মণীন্দ্রনাথ সাহা,**
নয়াপাড়া, গাজোল।

ঔরঙ্গজেব পিতৃহন্তারকই নন, ভ্রাতৃহন্তারকও ছিলেন

গত ২৫ ডিসেম্বর, স্বস্তিকা পত্রিকায় চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশিত মণিকা মুখার্জীর 'ঔরঙ্গজেব পিতৃহন্তারক হতে পারেন না' শীর্ষক পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আমার এই পত্রের অবতারণা। ঔরঙ্গজেব শুধুমাত্র একজন পিতৃহন্তারকই ছিলেন না, ভ্রাতৃহন্তারকও ছিলেন। ইতিহাস প্রমাণ যে, রাজসিংহাসনে বসার সময় তিনি তার তিন ভাই দারাশিকো, সুজা ও মুরাদকে হত্যা করার চেষ্টা করেন। সুজা পালিয়ে সারা জীবন আত্মগোপন করে থাকলেও মুরাদ ও দারাশিকোকে হত্যা করে ঔরঙ্গজেব নিজের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করেন। শুধু তাই নয়, ১৬৫৭ সালের ১০ আগস্ট ভাই দারাশিকোর মুণ্ডচ্ছেদ করে পিতা শাহজাহানকে ভাইয়ের কাটামুণ্ড উপহার হিসাবে পাঠিয়েছিলেন। সেই বছরই পিতা শাহজাহানকে আগ্রা দুর্গে আজীবন বন্দি করে রাখার ব্যবস্থা করেন। দ্বিতীয়ত, লেখিকার মতে ঔরঙ্গজেবের 'পরম ধার্মিক' হওয়ার কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ঔরঙ্গজেব হিন্দুদের ওপর জিজিয়া কর পুনঃস্থাপন করেন, তীর্থকর আরম্ভ করেন, ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দে শিখধর্মের নবম গুরু তেগ বাহাদুরকে দিল্লির রাস্তায় গলা কেটে হত্যা করেন। ফরমান জারি করে হিন্দু পাঠশালা, টোলগুলিতে ইসলামিক আইন জারি করেন ও বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেন। সুতরাং লেখিকার কল্পনাতে ঔরঙ্গজেব পিতৃপ্রেমী,

With Best Compliments From -

South Calcutta Diesels Pvt. Ltd.

Sales & Service

225-D, A. J. C. Bose Road, Kolkata - 700 020

Phone : 2302-5250/ 3/ 4, Fax : 033-2281-2509 / 2287-6329,

E-mail : scdtodi@scdtodi.com

Authorised Dealers of

- **BOSCH LTD.**
- **BOSCH, GMBH-GERMANY,**
- **DEUTZ, A. G., GERMANY**
- **LOMBARDINI - ITALY,**
- **V. M. MOTORI - ITALY**

SHYAM TEXTILES LTD.

156A, MAHATMA GANDHI ROAD

KOLKATA - 700 007

পরম ধার্মিক হলেও বাস্তবে তার নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতা, বর্বরতা ইতিহাসে এক জ্বলন্ত উদাহরণ। মণিকা দেবীর 'প্রেমিক সম্রাট' শাহজাহানের প্রসঙ্গে বলতে হয়, মুমতাজ মহলের প্রতি তাঁর প্রেম এতটাই গভীর ছিল যে মুমতাজকে বিবাহ করার পরেও তিনি আরও চারটি বিবাহ করেন। নূরজাহানের কন্যা লাডলির প্রতি তার অনুরাগ মুমতাজকে ভাবিয়ে তুলেছিল। উনিশ বছর বয়সে মুমতাজের বিবাহ হয় শাহজাহানের সঙ্গে। মুমতাজ জীবিত ছিলেন আরও উনিশটি বছর। এই উনিশ বছরের বিবাহিত জীবনে তিনি চোদ্দবার অন্তঃসত্তা হন। চিকিৎসকদের বার বার বারণ করা সত্ত্বেও তাকে লাগাতার গর্ভধারণ করতে হয়েছিল। তার শরীর এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে শয্যা থেকে উঠে-চলে বেড়াবার ক্ষমতাটুকুও চলে গিয়েছিল। মুমতাজের মৃত্যু হয় চোদ্দতম সন্তান প্রসব করতে গিয়ে। এবার আর যন্ত্রণা সহ্য করতে পারেননি তিনি। তার মৃত্যুর পর শাহজাহানকে পুনরায় বিবাহ করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু সত্য এটাই যে মুমতাজের মৃত্যুর পর আরও তিনটা বিবাহ করেন শাহজাহান।

শাহজাহান তার 'প্রিয়তমা পত্নী'র মৃতুকে ঘিরে যে পরিমাণ প্রেম ও শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন তার কণা পরিমাণও তিনি যদি মুমতাজকে সুস্থভাবে জীবিত রাখার জন্য চেষ্টা করতেন তাহলে হয়তো ইতিহাসে এতটা জনপ্রিয়তা অর্জন না করলেও 'আদর্শ পতি' হিসাবে তার স্থান অনেক উঁচুতে হতো।

সুতরাং বলা যায়, শাহজাহানের শিল্পবোধের খেসারত হিসাবে তাঁর আমলে ভারতের জনগণকে বহুবার দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। শুধুমাত্র তাজমহল নয়, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি অট্টালিকার প্রকৃত ইতিহাস, বিস্মৃত ইতিহাস নিয়ে অবশ্যই গবেষণা ও আলোচনা হওয়া উচিত। এটাই তো প্রগতিশীল জাতির লক্ষণ। সুতরাং কারোর কল্পনাতে গোরু গাছে উঠতে পারে, এমনকী আকাশেও উড়তে পারে, কিন্তু তাতে প্রকৃত ইতিহাস অনুধাবন করা যায় না।

—**পারুল মণ্ডল (সিংহ),**
উলুবেড়িয়া, হাওড়া।

পূরণচাঁদ কাহিনি

'তাজমহল আসলে শিবমন্দির' শীর্ষক নিবন্ধে (স্বস্তিকা, ১৩.১১.১৭), ড. প্রসিত রায়চৌধুরী বলেছেন--- ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর জাতমহলের গম্বুজে ফাটল ধরে; সাহেব ইঞ্জিনিয়াররা সেই ফাটল মেরামত করতে ব্যর্থ হলে পূরণচাঁদ নামে এক হিন্দু মিস্ত্রি সেই ফাটল মেরামত করে দেন। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার মন্ত্রী ছিলেন। তিনি বড়লাট লর্ড লিনলিথগোকে অনুরোধ করে ওই গ্রাম্য মিস্ত্রিকে রায়সাহেব উপাধি ও সরকারি ইঞ্জিনিয়ারের পদ পাইয়ে দেন। ড. রায়চৌধুরীর বিবরণে কিছু ভুল আছে। প্রধান ভুল, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কখনও বড়লাটের মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন না। ব্রিটিশ আমলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা বলে কোনো বস্তু ছিল না। স্বাধীনতা লাভের পর শ্যামাপ্রসাদ পণ্ডিত নেহরুর প্রথম মন্ত্রীসভায় শিল্প ও সরবরাহ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫০ সালে নেহরু-লিয়াকত চুক্তি তথা পাকিস্তান তোষণ-নীতর প্রতিবাদে ৮ এপ্রিল নেহরু-মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। পূরণচাঁদের কাহিনি সম্পর্কে পি.এন.ওক-এর দি তাজমহল ইজ এ টেম্পল প্লেস গ্রন্থে (৪র্থ অধ্যায়) অন্যরকম কথা আছে।

১৯৭৩ সালের ২৭ মে তারিখের মারাঠি দৈনিক লোকসত্তায় প্রকাশিত জনৈক গুলাবরাও জগদীশ-এর প্রবন্ধ উল্লেখ করে ঘটনাটি প্রসঙ্গে পি.এন.ওক বলেছেন : ১৯৩৯ সালের গোড়ার দিকে তাজমহলের গম্বুজে একটি ফাটল ধরে। ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়াররা ফাটলটি মেরামত করতে ব্যর্থ হলে একটি ইঞ্জিনিয়ার কমিটি (এ কমিটি অব ইঞ্জিনিয়ারর্স) গঠিত হয়। ওই কমিটিও কোনো উপায় উদ্ভাবনে ব্যর্থ হয়। এদিকে ফাটলটা আড়ে-দীর্ঘে বেড়ে চলছে; গম্বুজটি ভেঙে পড়ার আশঙ্কা হচ্ছে। বাঘা বাঘা ইঞ্জিনিয়াররা দিশাহারা। এহেন পরিস্থিতিতে সাদামাঠা চেহারার (rustic looking) পূরণচাঁদ এসে সুপারিন্টেনডিং ইঞ্জিনিয়ারকে আর্জি জানায় যে, ওই ধরনের ফাটল মেরামতির কাজে তাঁর অভিজ্ঞতা আছে (he possessed the know how to heal the cracx) ; তাকে একটা সুযোগ দেওয়া হোক। অনন্যোপায় ইঞ্জিনিয়ার সাহেব প্রস্তাবে রাজি হন।

পূরণচাঁদ কয়েকজন রাজমিস্ত্রিকে সঙ্গে নিয়ে কাজে লেগে যান; এক ধরনের চুন-সিমেন্টের মশালা তৈরি করে নিজে তিনি সেগুলি দিয়ে ফাটলটি ভরাট করে দেন। পূরণ চাঁদের মেরামতি এমন নিখুঁত হয়েছিল যে, কয়েকদিন পর মশলা জমাট বেঁধে যাওয়ার পর গম্বুজের দেয়ালের গায়ে ফাটলের দাগের কোনো চিহ্ন থাকেনি (there was not the slightest trace of the crack)। ঘটনাটি শুনে ভাইসরয় বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন, তাহলে একজন প্রায় নিরক্ষর হিন্দু রাজমিস্ত্রি তাঁর ইঞ্জিনিয়ারদের হারিয়ে দিতে পারে (that an all his engineer!)। বলা বাহুল্য, ভাইসরয়ের ওই মন্তব্যে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের আঁতে ঘা লেগেছিল। ফলে তারা পূরণচাঁদকে সুপারভাইজার পদে নিয়োগের যে ভাবনা-চিন্তা করছিল তাতে ইতি পড়ে যায়। পূরণচাঁদকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়নি।

১৯৪২ সালে ড. বি. আর. আম্বেদকর ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল-এ শ্রমদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য হন। পূরণচাঁদ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পূর্বাপর সব কথা শুনে ড. আম্বেদকর পূরণচাঁদকে ভাইসরয়ের কাছে নিয়ে যান; পূরণচাঁদের পরিচয় দিয়ে বলেন যে, ঐতিহাসিক ভবনসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়ে তিনি পূরণচাঁদকে সহকারী ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিয়োগ মনস্থ করেছেন। ড. আম্বেদকর ভাইসরয়ের কাছে পূরণচাঁদের এজন্য কোনো জাতীয় সম্মানের (for some national honour) সুপারিশও করেছিলেন। ভাইসরয় ওই সুপারিশে সম্মতি দেন; পুরণচাঁদকে 'রায়সাহেব' উপাধিতে ভূষিত করেন।

—**বিমলেন্দু ঘোষ,** কলকাতা-৬০।

নবাঙ্কুর

গাছপালাও সঙ্গীত রসিক হয়

ছোট্ট বন্ধুরা, বিশ্ব বিখ্যাত সাহিত্যিক শেক্সপীয়র একটি বিখ্যাত উক্তি করেছিলেন। তা হলো, 'যে মানুষ গানবাজনা ভালবাসে না, সে অতি সহজেই মানুষ খুন করতে পারে'। আবার বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন বলেছেন, 'মিউজিক ইজ দ্য মেডিসিন অব আওয়ার ব্রেকিং হার্ট'— অর্থাৎ গান বাজনা হলো আমাদের ভগ্ন হৃদয়ের ওষুধ।

মানুষ গানবাজনা যে ভালবাসে সে কথা আমরা জানি। কিন্তু শুধু মানুষই নয়, গাছপালাও যে সঙ্গীত রসিক, গাছপালাও যে সঙ্গীত বা গানের সুরে সাড়া দেয় তা আমরা কমই জানি। অবাক হয়ে যেতে হয় কথাটি শুনে। অবাক হয়ে যাবারই

কথা। কারণ, গাছপালা সঙ্গীত বা গানের সুরে সাড়া দেয় এমন কথা শুনলে সত্যিই আমাদের বিস্ময় জাগে।

কিন্তু হ্যাঁ। উদ্ভিদ জগতে গাছপালা, ফুল-ফলও যে সঙ্গীতরসিক, উদ্ভিদ জগতে বহু ধরনের গাছপালা সঙ্গীত বা গানের সুরে সাড়া দেয়— এই বিষয়ে বহু গবেষণা করে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে এসেছে। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা গাছপালার বৃদ্ধি বা অন্যান্য আচরণে বাইরের নানা শক্তির (যেমন তাপ, আলো, বিকিরণ এবং অবশ্যই সঙ্গীত ইত্যাদি) প্রভাব যে কতখানি, সেই সম্বন্ধে বহু গবেষণা করেছেন। জানা গিয়েছে যে, খুব সকালে গাছপালার ফুল ও গাছের কোষ বৃদ্ধি ঘটে অনেক বেশি পরিমাণে এবং বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই বৃদ্ধির হার ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে, খুব নরম সুরের সঙ্গীতে (সফট্ মিউজিক) গাছের বৃদ্ধির ব্যাপারটি সূর্যোদয়ের বহু আগে থেকেই ঘটাতে পারে। একটি বিদ্যুৎচালিত সুর শলাকাকে (টিউনিং ফর্ক) কাছে এনে এবং সেটিকে কম্পিত করে এই সত্য প্রমাণ করা সম্ভব।

ভারতীয় বৈজ্ঞানিক টি.এন. সিংহ দীর্ঘ গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বাজনা শুনিয়ে গাছের বৃদ্ধি ও উৎপাদন সম্ভব। বিভিন্ন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মধুর সুরের প্রভাবে গাছ অনেকাংশে লম্বা হয় এবং শক্তিশালী ও সতেজও হয়। বৈজ্ঞানিক টি.এন. সিংহের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কেন্টারিতে এবং কানাডার অন্টারিওতে রবিশঙ্করের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রেকর্ড শুনিয়ে তামাক, চীনাবাদাম, আম এবং ধানের ফলন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। ব্যাপারটি প্রচার হতেই সে দেশের এক রেকর্ড কোম্পানি 'মিউজিক টু গ্রো প্ল্যান্টস বাই' নাম দিয়ে একটি রেকর্ডও বের করে ফেলেছেন।

আবার একথাও শোনা যায় যে, সঙ্গীত বিশারদ তানসেন তাঁর মধুর রাগের সাহায্যে ফুল ফোটানোর কার্যে সহায়ক হতেন।

বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাগারে 'আফ্রিকান ভায়োলেট', 'অমলতাশ' কথ্য ভাষায় যার নাম 'বাঁদর লাঠি' ইত্যাদি আরও কত কী ফুল, বিভিন্ন ধরনের গমের চারার ওপর মিশ্র সঙ্গীত প্রয়োগ করে দেখেছেন ফুল গাছগুলি ও গমের চারাগুলি মিশ্র রাগ সঙ্গীতের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রথম কয়েক দিনের মধ্যে বৃদ্ধির হার অনেক বেড়ে গিয়েছে এবং ফুল ও ফল ধরেছে।

তাই সহজেই বলা যায় যে, গাছকে যদি কোমল, মধুর সুর বিশিষ্ট সঙ্গীতের প্রভাবে ও সান্নিধ্যে রাখা যায়, তাহলে তার উপর ওই সঙ্গীতের প্রভাব যথেষ্ট কার্যকরী হয়। এতে প্রমাণিত হয় সঙ্গীত ও বাজনা কেবলমাত্র মানুষেরই নয়, মানুষের মতো গাছেরও হর্ষ উৎপাদন করে। গাছপালারাও সঙ্গীত রসিকতায় যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তার প্রমাণ সহজেই পাওয়া যায়। ছোট্টবন্ধুরা, গাছেরও যে প্রাণ আছে, সেই যুক্তির পক্ষে এর থেকে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে?

(সংগৃহীত)

ভারতের পথে পথে

নন্দীকেশ্বরী মন্দির

বীরভূম জেলার সাঁইথিয়ায় নন্দীকেশ্বরী একান্ন শক্তিপীঠের একটি। এখানে সতীর কণ্ঠহার পড়েছিল। ১৩১০ বঙ্গাব্দে বর্তমান মন্দির তৈরি হয়। অশ্বত্থ ও বটগাছের নীচে বাঁধানো বেদির প্রকোষ্ঠে তেল-সিঁদুরে চর্চিত ত্রিকোণা শিলাখণ্ডই দেবীর প্রতিভূ। দেবীর ভৈরব নন্দীকেশ্বরও মূর্তিহীন। বৃক্ষদু'টির কোটরে শিবজ্ঞানে পূজিত হন নন্দীকেশ্বর। এছাড়াও রয়েছে কালীয়দমন রূপে শ্রীকৃষ্ণ, শীতলা, গণেশ, গৌরীমাতা। বিজয়াদশমীতে জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব হয়। নন্দীকেশ্বরীর বিপরীতে রয়েছে রক্ষাকালী মন্দির। সারা বছর এখানে ভক্তদের সমাগম হয়।

জানো কি?

মানুষের :

- স্বাভাবিক রক্তচাপ : ১২০-৮০।
- সবচেয়ে বড় অঙ্গ : চামড়া।
- সবচেয়ে বড় গ্রন্থি : লিভার।
- সবচেয়ে ছোট কোষ : রক্তকোষ।
- শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা : ৯৮.৪ ফা:।
- সদ্যোজাত শিশুর গড় ওজন : ২.৬ কেজি।
- ১ মিনিটে নাড়ির স্পন্দন : ৭২ বার।

ভালো কথা

'পর দ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ'

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। তবু আমার বেশ মনে আছে। আমাদের প্রচারক ধনেশ্বরদা চরিঅনন্তপুরে রাস্তায় পুরনোদিনের একটি খুবই পুরনো বাংলা অভিধান রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে নিবাসে নিয়ে এসেছিলেন। পরদিনই ভালো করে বাঁধিয়ে নিয়েছিলেন। ধনেশ্বরদা বললেন খুব দামি বই, কাজে লাগবে। কয়েকদিন পর চরিঅনন্তপুরের এক মাস্টারমশাই খবর পেয়ে নিবাসে এসে হাজির। ধনেশ্বরদাকে বললেন, বাড়ির লোক পুরনো ছেঁড়া বই প্রয়োজন নেই ভেবে ফেলে দিয়েছে, ফেরত দিলে খুব ভালো হয়। ধনেশ্বরদা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাতে বইটি দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন— 'পর দ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ'।

হিমাদ্রি ত্রিবেদী, দ্বাদশ শ্রেণী, গোলাপগঞ্জ, মালদা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) নি অ বে তি

(২) দাঁ আ ল ক্কে

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) চে র জি য়া ই

(২) ন্দ্র ঈ চ র শ্ব

১৫ জানুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) মহোৎসব (২) স্মৃতিফলক

১৫ জানুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) ভাবোন্মাদ (২) পদ্মাবতী

উত্তরদাতার নাম

(১) প্রত্যুষা দেবনাথ, গাইঘাটা, উ: ২৪ পরগনা। (২) রূপষা দেবনাথ, নিমতা কলকাতা-৪৯ (৩) সৌরিন কেশ, পার্বতীপুর, বর্ধমান। (৪) সংযুক্তা ব্যানার্জী, লাগদা, পুরুলিয়া।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

With Best Compliments From :-

ASHOK AGARWALA

PRAGATI IMPEX PVT. LTD.

5, Clive Row, 2nd Floor,
Room No. 41
Kolkata - 700 001

DAYAL INDUSTRIES

DAYAL GROUP

MAKER OF INDUSTRIAL BLADES

Works
GOPALPUR HOUSE P.O. : R. GOPALPUR
GOPALPUR, 24 PARGANAS (North)
PIN-700 136

Office :
3, Synagogue Street,
Room No. 12, 2nd Floor, Kolkata 700 001
PHONE : 22424296/22434571, 033-22421761

সুস্বাস্থ্য

চিনির গুণাগুণ

সত্যানন্দ গুহ

চিনি বা চিনিজাত খাবার কে না পছন্দ করেন। খাবারের দোকানগুলি চিনির সামগ্রী নিয়েই পসরা সাজায়। তাছাড়া হাতের কাছের বিস্কুট, চকোলেট, জেলি স্কোয়াশ ইত্যাদি তো চিনি দিয়েই প্রস্তুত। শুধু কিশোর কিশোরী নয় ছেলে বুড়ো সকলেরই চিনি অতি প্রিয় বস্তু। চিনি ছাড়া চা, কফি, হরলিকস সবই যে অচল।

গুড় তো আজ ব্রাত্য হয়ে আছে। গরিব মানুষ ছাড়া গুড়ের ব্যবহার ধনীদের মধ্যে দেখা যায় না। মধ্যবিত্তরা কালেভদ্রে স্পর্শ করেন। আজকাল ঘরে ঘরে, স্কুলে-কলেজে, শোনা যায় ছাত্র-ছাত্রীরা বড্ড চঞ্চল, উদাসীন। প্রাশয়ই নানা রোগে ভোগে। ফলে পাঠে অমনোযোগী, ধীর স্থির হয়ে বেশিক্ষণ একস্থানে বসতে পারে না। চিনিই যে এই শত্রুতা করছে কে তার খোঁজ রাখে? চিনিকে চিনে নিতে হবে। বাজারের চিনিই শুধু নয়— গুড়, মধু, ভাত, রুটি, বিস্কুট, চিড়া, মুড়ি, বার্লি, সাবু ইত্যাদি শর্করা বা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যই চিনিতে রূপান্তরিত হয়।

ভাত আর চিনি দুইই শর্করা। খোসা বা আবরণের মধ্যে থাকলে তাকে শ্বেতসার খাদ্য বলে। চাল, ডাল, গম ইত্যাদি শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য। আমাদের শরীরে শর্করার বিরাট ভূমিকা আছে। একে দেহযন্ত্রের ইন্ধন বলা যায়। তাপ এই শক্তি উৎপন্ন করে। অঙ্গ সঞ্চালন, হৃদপিণ্ডের দহনে শর্করা জাতীয় খাদ্য পেটে গিয়ে চর্বিতে পরিণত হয়। জ্বর বা কোনো অসুখ হলে শরীরের সঞ্চিত শর্করা ক্ষয় হয়। শর্করা খেয়াল খুশিমতো খেলে চলবে না। ১০ থেকে ১৫ শতাংশ যথেষ্ট।

শর্করা প্রধান খাদ্যে নানাবিধ রোগ হতে পারে। কোষ্ঠবদ্ধতা, অগ্নাশয়ের (Pancreas) বৈকল্য, শারীরিক দুর্বলতা, রক্ত ঘন হয়ে যাওয়া, ডায়াবেটিস (ব্লাড সুগার), স্থূলতা, রক্তাল্পতা, চামড়ার সংকোচন, দাঁতের রোগ, পাকস্থলীর রোগ, একজিমা ও নানা ধরনের চর্মরোগ, অম্লরোগ, গ্যাসট্রিক আলসার, শ্লেষ্মার দোষ, হার্টের রোগ ইত্যাদি দেখা দেয়। একটা রোগ থেকে অন্য রোগও হতে পারে। তবে কি চিনি খাওয়া চলবে না? নিশ্চয় চলবে। জেনে রাখতে হবে, শস্য জাতীয় শ্বেতসার অথবা সোজাসুজি চিনি বেশি না খেয়ে মূল জাতীয় শ্বেতসার অথবা গুড় খাওয়া ভাল। বেশি গুড়, মধুও ভাল নয়। তাই শর্করার জন্য আলু, বিট, গাজর, খেজুর, কিশমিশ ইত্যাদি খাওয়া ভাল। ফল, মূল, শাক-সবজিতেই শর্করা আছে। আলু, মূলা, শাঁখালু ইত্যাদি কাঁচা খেলে সহজে হজম হয়, পাকস্থলী থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে। মল নরম হয়। ফলে কোষ্ঠবদ্ধতা হয় না। ডায়াবেটিস রোগীদের কাঁচা ফলমূল, শাকসবজি খাওয়ার জন্য প্রাকৃতিক চিকিৎসকগণ বিধান দেন।

চিনি বেশি খেলেই যে ডায়াবেটিস হবে তা সবসময় খাটে না, অন্য রোগ হতে পারে। তবে ডায়াবেটিস হলে শর্করা জাতীয় খাদ্য কম খেতে হয়। বেশি খেলে শরীরে শর্করার পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়, বাড়তি চিনি রক্ত ধরে রাখতে পারে না। প্রস্রাবের মাধ্যমে বেরিয়ে আসতে চায়। চিনি ধরে রাখতে না পারাকেই ডায়াবেটিস বা মধুমেহ রোগ বলে।

চিনি জাতীয় খাদ্য লালা ছাড়া হজম হয় না। রিফাইন চিনিতে ভিটামিন, লোহা, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি থাকে না। ধাতব লবণ না থাকায় সজীবতা কমে যায়। দুর্বলতায় চিনির সরবত, গ্লুকোজ, ইলেক্ট্রল, হরলিকস, ভিভা, মিল্কোজ ইত্যাদি চিনিজাত পানীয় সাময়িক ভাবে আরাম দিলেও আখেরে ক্ষতি করে। লজেন্স, চকোলেট, চুইংগাম, বাবলগাম ক্যাডবেরি ইত্যাদি রক্তে চিনি বা শর্করা উৎপাদন করে। ভাত ও রুটির মধ্যে ধাতব লবণ ও ভিটামিনের অভাবহেতু শাকসবজি ও ছিবড়া জাতীয় ফল মূল বেশি খেতে হয়। মনে রাখতে হবে, চিনিও এক প্রকার সাদা বিষ।

(লেখক প্রাকৃতিক চিকিৎসক)

খেলার জগৎ

আলির পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন বিজেন্দ্র

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

'আই অ্যাম দ্য গ্রেটেস্ট।' তার মুখে বারবার শোনা এই ছোট্ট শব্দবন্ধটি এক চিরকালীন প্রবাদে পরিণত হয়েছে। আর এই নামে যে বইটি সম্প্রতি বের করেছে বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন প্রকাশনা সংস্থা হার্পার কলিন্স, তা দৈর্ঘ্য প্রস্থে এক সুবৃহৎ অবয়ব ধারণ করেছে। বইটির ক্রয়মূল্যও চোখ কপালে তুলে দেওয়ার মতো— পাঁচশো ডলার। অর্থাৎ ভারতীয় মূল্যে তিরিশ হাজার টাকার মতো। ক্যাসিয়াস ক্লে থেকে মহম্মদ আলিতে রূপান্তর যেন অলীক রূপকথা। গত পঞ্চাশ বছরে গোটা দুনিয়ার জনমানসে এতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন মহম্মদ আলি যে বিবিসি তাকে সব অর্থেই 'গ্রেটেস্ট সুপার ম্যান' অভিধায় ভূষিত করেছে। সম্প্রতি ভারতীয় বক্সার বিজেন্দ্র সিংহ এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে তার ইচ্ছে ও স্বপ্ন মহম্মদ আলির মতো এমন অতি মানবিক সত্তায় উন্নীত হয়ে ক্রীড়াসংস্কৃতির অভিমুখটাই বদলে দেওয়া।

বিজেন্দ্র পেশাদার বক্সিংয়ে এসে এখনো পর্যন্ত অপরাজিত। দশটি রাউন্ড জিতেছেন। এশিয়া প্যাসিফিক মিডলওয়েট চাম্পিয়ন তিনি। তাঁর মুখে এসব কথা মোটেই অতিরঞ্জিত শোনায় না। কিন্তু আলির জুতো পায়ে গলাতে গেলে যে জীবনের চেয়ে বড় কিছু করে দেখাতে হয়। যেমন আলি করে দেখিয়েছেন। আমেরিকা-ভিয়েতনাম দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায় আলি যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে দাঁড়িয়ে আবেদন করলে। অবশ্য যুদ্ধে না যাওয়ার জন্য মার্কিন সরকারের প্রভাবে বিশ্ববক্সিং সংস্থা তাঁর হেভিওয়েট বিশ্ব চাম্পিয়ন খেতাব কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু তদানীন্তন পোপ এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব তাকে বিশ্বমানস হৃদয়ের চাম্পিয়ন বলে অভিমত দিয়েছিলেন। তারপর আরও তিন বার তিনি বিশ্ব চাম্পিয়ন হয়েছিলেন।

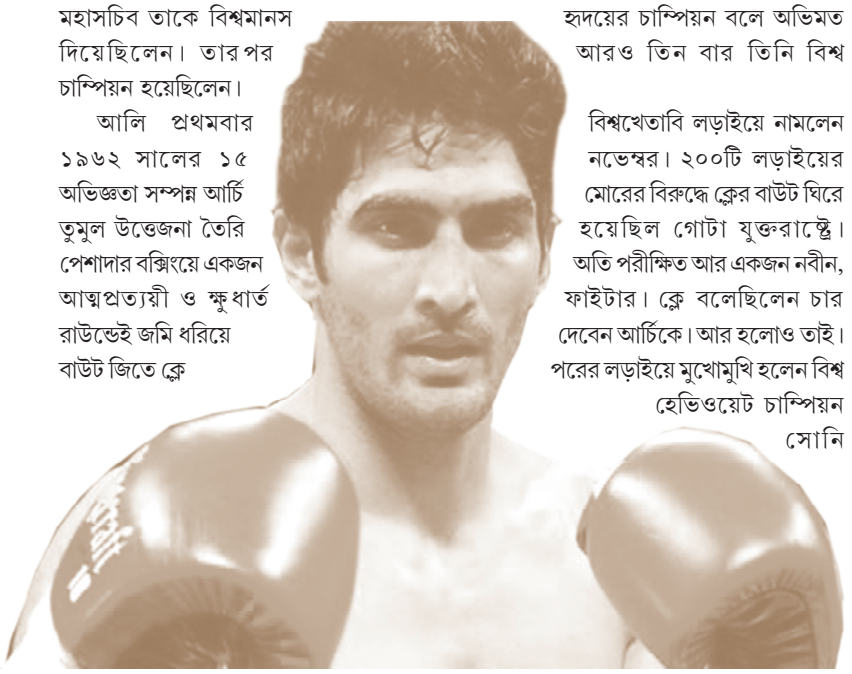

আলি প্রথমবার বিশ্বখেতাবি লড়াইয়ে নামলেন ১৯৬২ সালের ১৫ নভেম্বর। ২০০টি লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আর্চি মোরের বিরুদ্ধে ক্লের বাউট ঘিরে তুমুল উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল গোটা যুক্তরাষ্ট্রে। পেশাদার বক্সিংয়ে একজন অতি পরীক্ষিত আর একজন নবীন, আত্মপ্রত্যয়ী ও ক্ষুধার্ত ফাইটার। ক্লে বলেছিলেন চার রাউন্ডেই জমি ধরিয়ে দেবেন আর্চিকে। আর হলোও তাই। বাউট জিতে ক্লে পরের লড়াইয়ে মুখোমুখি হলেন বিশ্ব হেভিওয়েট চাম্পিয়ন সোনি লিস্টনের। কালাপাহাড় লিস্টন অনুশীলনে বুনো মোষের শরীর এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছিলেন। দানবীয় শক্তির অধিকারী লিস্টন যে পেশাদার রিংয়ে নামা অনভিজ্ঞ যুবকের খুলি ফাটিয়ে দেবে, এই আশঙ্কা থেকে মার্কিন পত্রপত্রিকার একাংশ বিশ্ব বক্সিং সংস্থাকে এই লড়াই বাতিল করার জন্য প্রচুর চাপ দিয়েছিল।

আর যত এসব প্রতিক্রিয়াশীল কথাবার্তা চাপাচালি হচ্ছিল মিডিয়াতে ততই যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আত্মনিবিষ্ট বক্সারে পরিণত হয়ে ওঠেন ক্যাসিয়াম ক্লে। ক্লাসিকাল ট্রেনিং ও অ্যারোবিক যোগের মাধ্যমে ক্লে নিজেকে নিয়ে গেলেন এমন উচ্চতায় যে লিস্টন কেন, দুনিয়ার কোনো শক্তিই তাকে বেঁধে ফেলতে পারবে না। বিশ্বজুড়ে প্রবল আলোড়ন তোলা সেই লড়াইয়ে ক্লে লিস্টনকে গোটা রিং ছুটিয়ে বেড়িয়ে বেদম করে ক্রমান্বয়ে হুল ফুটিয়ে গেলেন। সেই লড়াই দেখে বিবিসি ক্লের স্টাইল অব বাউটিংকে বলল 'প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়ায় আর বোলতার মতো হুল ফোটায়'। এরপর যতবার রিংয়ে নেমেছেন ক্লে পরবর্তীতে আলি এই ধারা বজায় রেখে লড়ে গেছেন। গোটা রিং বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে নিপুণ ব্যালে ডান্সারের স্টেপিং-সহ ফরোয়ার্ড কিংবা ব্যাকওয়ার্ড মুভ করে নিখুঁত লক্ষ্যভেদী পাঞ্চ কিংবা জ্যাব। তাঁর লড়াই যেন নান্দনিক সৌন্দর্যেভরা এক ভয়ঙ্কর শক্তিশালী ঝড়। যা বারে বারে আছড়ে পড়েছে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরুর মধ্যে নানা দেশে।

বিশ্ব বক্সিংয়ের ইতিহাসে বহু চিরস্মরণীয় বক্সার এসেছেন যাঁরা শক্তি বুদ্ধি ও শিল্পের মিশেলে খেলাটিকে মহাকাব্যিক রূপ দিয়েছেন। জো লুই, রকি মার্সিয়ানো, ফ্লয়েড প্যাটারসন, জো ফ্রেজিয়ার, ল্যারি হোমস, ইভান্ডার জ্যোলিথিড এবং অবশ্যই ক্লে ওরফে আলি হলেন এই টোটালি ঘরানার বক্সার। আর সোনি লিস্টন, জর্জ ফোরম্যান, মাইক টাইসনরা হলেন অতি মাত্রিক শক্তিনির্ভর মারকাটারি বক্সার। সব ধরনের স্টাইল ও স্ট্রাটেজিকে আত্মস্থ করে মহম্মদ আলি জীবিতকালেই হয়ে ওঠেন চলমান প্রতিষ্ঠান। রিংয়ের বাইরে আলি ছিলেন কৃষ্ণাঙ্গ দুনিয়ার মানুষের কাছে জীবন্ত আইকন। কালো-সাদা সমানাধিকারের জন্য তার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর এবং তা প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনভর লড়াকু ভূমিকা মার্টিন লুথার কিংয়ের মতোই আলিকে কালো মানুষের হৃদয়ের সম্রাট করে বাঁচিয়ে রাখবে। আর শেতাঙ্গ দুনিয়া তাঁর মূল্যায়ন করবে অবিস্মরণীয় সব লড়াইয়ের উপাদান খুঁজে। ■

With Best
Compliments
From :-

Punjab Glass Depot

P. K. GOENKA
BUSINESS MENTOR

Birla Sun Life Insurance Company Limited

2, Cilve Ghat Street
(Sagar Estate) Ground Floor,
Unit No. 22, Kolkata - 700 001
www.birlasunlife.com

Office : 033-22304784

Mobile : 9830029558
E-mail : pk_goenka@vsnl.net

Rang Rez Sarees

Wholesalers of Fancy Printed & Embroidered Sarees

45/1, Rafi Ahmed Kidwai Road

(Entrance also from 77/1/A, Park Street)

2nd floor, Kolkata - 700 016

PHONE : 2265-9147, 2265-0772 (Shop),

for Designer Super Net Sarees

With Best Compliments from :

R. C. Bhandari

Advisor, Mutual Funds

36, Basemant, 8, Camac street

Kolkata–700017

Tel. No. 2282 7928

JALAN JAN KALYAN TRUST

Flat No. 1A, Paramount Apartments

25, Ballygunge Circular Road

Kolkata - 700 019, TEL : 2475-6524, 2475-7760

Fax : 2475-7619, E. mail : madhuban@salyam.net.in

SANHIT GROUP OF COMPANIES

Sriniketan Road, Bolpur, Birbhum, West Bengal - 731204
Phone : +91+3463-255-560 / 257-769, E-mail : sanhitpolymer@yahoo.co.in
Fax :+91-3463-254215

Factory : Shibtala-Surul Road, Bolpur, Dist. : Birbhum, West Bangal 731204, Phone : +91+3463-234517 / 645017 / 09732024706

APPLICATION

Industry & Packaging

Jumbo Bag Liner
Black Wraping Film
Temporry Shed (by Film)
Pallet Cover
Shrink Wrapping Film for Black Goods

Civil & Construction:

Construction Film for concrete
Separation membrane for Road Construction
Liner for Hazards West Pond
Liner for Water Reservoir
Disposal Glass & Cup

With Best Compliments From :-

MUKHERJEE ENGINEERING CO.

Manufacturer of

R. C. C. SPUN PIPES, COLLARS & ALLIED ITEMS

Head Office & Workshop

Sriniketan Road, Bolpur, Pin - 731 204

Phone : (03463) 254-215 (O), Mobile : 9434009737, 919434762433
E-mail : mukherjeeengineeringco@yahoo.com Fax : 03463-254215

रेल बढ़े देश बढ़े
rail badhe deesh badhe

স্বচ্ছ রেল - স্বচ্ছ ভারত

সতর্ক হোন ! রেল ব্যবহারকারী ও যাত্রীগণ

রেলওয়ে পরিসর, স্টেশন ও কামরা পরিচ্ছন্ন রাখতে আমাদের সাহায্য করুন

ট্রেনে, প্ল্যাটফর্মে এবং রেল পরিসরে
আবর্জনা বা থুতু ফেলা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ

থুতু ফেলা নিষিদ্ধ

বাসনপত্র মাজা নিষিদ্ধ

আবর্জনা ফেলা নিষিদ্ধ

অনুগ্রহ করে :

- রেলওয়ে চত্বরে থুতু বা আবর্জনা ফেলবেন না অথবা নোংরা জমা করবেন না। থুকদানি বা ময়লা ফেলার পাত্র ব্যবহার করুন
- রেলওয়ে চত্বরে রান্না, স্নান, প্রস্রাব ও মলত্যাগ করবেন না, পশু-পাখিকে খাওয়াবেন না। সাইকেল/গাড়ি মেরামত বা সাফাই করবেন না এবং বাসনপত্র বা জামাকাপড় পরিষ্কার করবেন না
- রেলওয়ে স্টেশনের দেওয়ালে বা ট্রেনে এবং রেলওয়ে চত্বরে পোস্টার লাগাবেন না, কোনও বিষয়ে লিখবেন না ও আঁকবেন না
- স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনের শৌচাগার ব্যবহার করবেন না

জরিমানা ₹ ৫০০ পর্যন্ত হতে পারে

রেলওয়ে আইন, ১৯৮৯ এবং ভারতীয় রেলওয়ে বিধি-২০১২ অনুসারে কোনও কর্মের দ্বারা রেলওয়ে চত্বরের পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি ভঙ্গ করা নিষিদ্ধ - আইন ও বিধিভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে জরিমানা ধার্য হবে।

যে কোনও ধরনের নিয়মভঙ্গের পরিণাম জরিমানা

পূর্ব রেলওয়ে
পরিচ্ছন্ন পরিবেশ রক্ষার্থে সচেষ্ট

ALWAYS EXCLUSIVE

Vandana SAREES

Cotton Printed Sarees

Contact - 22188744/1386

Baijnath Shreelal

-: Mfgs. of :-

Handloom Silk,
Furnishing Cloth and
Cotton Dress
Materials

Head Office
Nathnagar, Bhagalpur (Bihar)

Branch Office
193/1, Mahatma Gandhi Road
Kolkata - 700 007
Mobile : 9831126557

ACC LOGISTICS

Fleet Owners & Transport Contractors

Registered Government Contractor

40, Girish Park (North),
1st Floor, Suit # 01
Kolkata - 700 006
(Near Calcutta Medicos)

An ISO 9001:2008 Company

Phone : +91 33 2530 7780 / 81, E-mail : ashok@acclogistics.in
URL : www.acclogistics.in

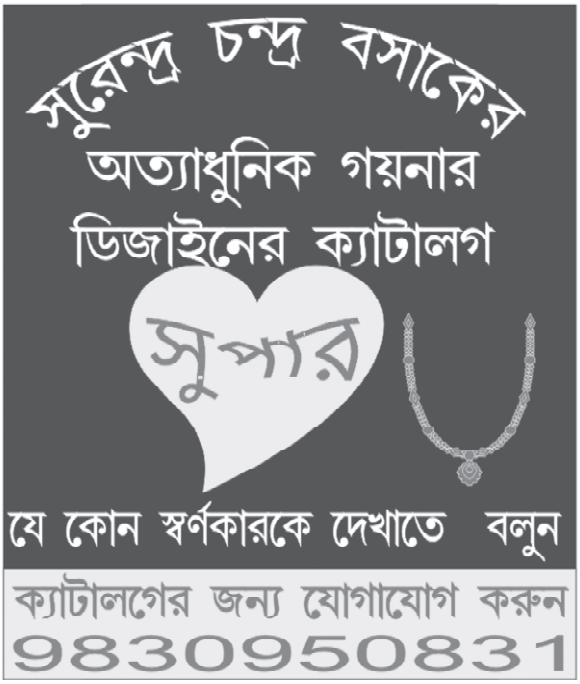

OMEX (INDIA) SALES PVT. LTD.

Earth Moving, Mining, Auto & General Machinery Spares

6, Mangoe Lane, 2nd Floor,
Kolkata - 700 001

Phone : 2210-3267, 2248-0761

Fax : 22102969,

E-mail : omexindi@cal2.vsnl.net.in

With Best Compliments From :-

Hommage Commercial Private Limited

MEM

M. E. M. INDUSTRIES

AN ISO 9001 : 2008 Company

e-mail : cables@memindustries.com
Poddar Court, Gate no. 4, 2nd floor,
18, Rabindra Sanani,
Kolkata-700 001,
Phone : 22357998, 22352996,
Telefax : 033-22351868

OUR RANGE

- Compensating Cables
- High Temperature Cables
- Instrumentation Cables
- Trailing Rubber Cables
- Control & Frls Cables
- Thermocouples & RTD

Also Sole Distributor BELDEN (USA)Cables.

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. KOL RMS/048/2016-18
22 January - 2018 - Rs. 10.00, (Republic Day Spl. Issue)

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. ।। দাম ১০্ টাকা ।।